দার্জ্জিলিঙ্গ-প্রবাসীর পত্র

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

লিখিত

কৃষ্ণনগর আমিনবাজার হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কলিকাতা

২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত

১৮৯৫

বিজ্ঞাপন।

এখানকার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ হইয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসে দার্জ্জিলিঙ্গ নগরে গমন করেন। তথা হইতে তিনি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অতীব প্রীত হইয়া উহা সাধারণের গোচর করিবার জন্য তাঁহাদের উভয়ের অনুমতি প্রার্থনা করি। তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে পত্রখানি প্রকাশিত করিলাম। ভরসা করি পাঠকমাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিবেন। ইতি

কৃষ্ণনগর
আমিনবাজার
পৌষ ১৩০১

শ্রীপ্রসন্নকুমার সরকার।

দার্জ্জিলিঙ্গ-প্রবাসীর পত্র।

দার্জ্জিলিঙ্গ, সাউথ ভিউ।

৪ঠা জুলাই, ১৮৯৪।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়

সমীপেষু—

নমস্কারনিবেদনমিদম্—

এখানে আসিয়া দুই চারি দিবস পরে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতে 'মহাকাল'-পাহাড়ের বিষয় লিখিত ছিল। আপনি তৎপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের বৃত্তান্ত লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমার ভ্রমণের আমূল বৃত্তান্ত আপনার গোচর করিতেছি। ভরসা করি, বিরক্তির সহিত পাঠ করিবেন না।

আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গত ১৩ই জুন বুধবারের দিন অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময়ে বগুলা ষ্টেশনে দার্জ্জিলিঙ্গ-মেল গাড়ী আরোহণ করিয়াছিলাম। একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আমি স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি লইয়া প্রবেশ করি। ঐ গাড়ীতে অন্য লোক উঠে নাই, তজ্জন্য পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী দামুকদিয়া ঘাট পর্য্যন্ত বিনা কষ্টে আগমন করিলাম। দামুকদিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ "ব্রড গেজে" (Broad guage) নির্ম্মিত। গাড়ীগুলি বড় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেশী লোক-সমাগম না হইলে আরোহীদের আদৌ কষ্ট হয় না। দামুকদিয়া ঘাটে ষ্টীমারে উঠিয়া প্রবল পদ্মা নদীর উত্তরপারস্থিত সারা ঘাটে উপনীত হইলাম। সারা হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত রেলপথ 'মিটর' গেজে নির্ম্মিত। এই পথের দৈর্ঘ্য ১৯৬ মাইল। গাড়ীগুলি মাঝারি রকমের। চারিজন ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে একটী কামরায় যাইতে পারে, কিন্তু কামরার শিরোভাগে লিখিত আছে, "আট জন লোক বসিতে হইবে"। আমরা স্ত্রী পুরুষ দুই জন, একটী বড় কন্যা, চারিটী ছোট বালক বালিকা ও দুই জন ঝি, একুনে নয় জন একটী কামরায় প্রবেশ করিলাম।

চাকর, ব্রাহ্মণ, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিল। অতি কষ্টে শিলিগুড়ি পৌঁছিলাম। শিলিগুড়ি, উত্তর-বঙ্গ-রেলওয়ে লাইনের সীমান্ত ষ্টেশন। জলপাইগুড়ি ষ্টেশন ছাড়িয়াই দূরে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী নয়ন-গোচর হইয়াছিল সত্য; কিন্তু তখন পর্ব্বত বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি নাই, কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা বলিয়াই ভ্রম হইয়াছিল। দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকা সঙ্গে লইয়া বিদেশ-ভ্রমণ অতীব কষ্টকর। ১৪ই জুন শিলিগুড়িতেই অতিবাহিত করিলাম। তথায় একটী সুন্দর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ডাক-বাঙ্গলা আছে। উহা ষ্টেশনের অতি নিকটে এবং বাসের অনুপযুক্ত স্থান নহে। থাকিবার স্থান পাইলাম বটে, কিন্তু আহারাদির বড়ই কষ্ট হইল। একটী কদর্য্য দোকান-ঘরে, ব্রাহ্মণটী 'ডাইল ও ভাত' পাক করিয়া আনিয়া দিল। প্রজ্ব-লিত উদর-দেবকে তদ্দারা বহু আরাধনায় শান্ত করিলাম। পর দিবস অতি প্রত্যূষে একটী বন্ধু অন্ন ব্যঞ্জনাদি আনিয়া দিলেন, কিন্তু তখন অসময় বলিয়া আহার করিতে পারিলাম না। এখান হইতে প্রাতে নয়টার সময় গাড়ী ছাড়ে, কিন্তু সে দিবস গাড়ীর এঞ্জিন্ পথিমধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল বলিয়া, দশটার

পর গাড়ী শিলিগুড়িতে পৌঁছিল। প্রায় এগারটার সময়ে দার্জ্জিলিঙ্গ-হিমালয় রেলগাড়ী, আরোহী লইয়া গর্ভবতী ললনার ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া মন্থর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। এই রেলপথ ন্যারো (narrow) গেজে নির্ম্মিত। গাড়ীগুলি বড়ই ছোট, একটী কামরায় দুই জনও স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে না; কিন্তু ইহার শিরোভাগেও "আট জন বসিতে হইবে" এই আদেশ-বাক্য কৃষ্ণাক্ষরে লিখিত আছে। একটী কামরাতে আমরা নয় জন আরোহী; তথায় তিল পর্য্যন্ত রাখিবার স্থানাভাব। পার্শ্বপরিবর্ত্তন, কি পদ-সঞ্চারণ একবারে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল; সকলেই স্পন্দরহিত প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়াছিলাম। বালক বালিকাগণের কষ্টের সীমা ছিল না। গাড়ীগুলি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তাহাতে আবার খোলা; তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যে গাড়ীতে আমরা উঠিয়াছিলাম, তাহার কাচের দুয়ার ছিল; তজ্জন্য বালক বালিকাগণের সহসা পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হই নাই। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ পর্য্যন্ত ৫০ঃ মাইল রেলপথ পরিভ্রমণ করিতে প্রায় ৭ ঘণ্টা সময় লাগে। ১৮৮০।৮১ সালে এই পথ প্রস্তুত হয়। এই পথ নির্ম্মা-

ণের পূর্ব্বে 'হিল কার্ট রোড' নামক রাস্তা অবলম্বন করিয়া লোকে, টোঙ্গা ও গো-মহিষাদির শকট আরোহণে দার্জ্জিলিঙ্গ গমন করিত। সে রাস্তাটী এখনও বর্ত্তমান আছে ও পাহাড়িয়াদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ঐ রাস্তার প্রায় সমসূত্রে রেলপথ গমন করিয়াছে।* শিলিগুড়ি হইতে সুকনা ষ্টেশন পর্য্যন্ত সাত মাইল সমতল ভূমি। গাড়ী ভয়ানকরূপে নড়িতে নড়িতে চলিল। সুকনা, হিমালয় পর্ব্বতের নিম্নভাগ। সমগ্র ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। বিহার প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে আসাম প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ বিস্তৃত আছে। এই অংশ ৮০০ মাইল দীর্ঘ ও ১০০ মাইল প্রশস্ত, এবং ইহাতেই নেপাল, সিকিম, তিব্বত ও ভূটান দেশ। বোধ হয় আপনি অবগত আছেন যে, ঈদৃশ উচ্চ পর্ব্বত পৃথি-

---

* যদিও বহু কষ্টে এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দ্বারা মালিকগণের ক্ষতি হয় নাই। দার্জ্জিলিঙ্গ-হিমালয় রেলওয়ে কোম্পানির মূলধন ৩১ লক্ষ টাকা; ১৮৯২ সালে উক্ত কোম্পানি ২,৬৬,৬৪৭ টাকা লাভ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তাঁহারা শতকরা ৮॥০ টাকা হিসাবে সুদ পাইয়াছিলেন।

বীতে আর দ্বিতীয় নাই। স্থকনা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে নিবিড় বনে প্রবেশ করিলাম। দুই পার্শ্বে বৃহদাকার বৃক্ষ সকল গগন ভেদ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাল, শিশু, শিমুল, চাম্পা, বুক, মৌহা প্রভৃতি পরিচিত, ও চিলানী, পানী, সাজ, টাট্রা, সিদা, গুগ্‌গুল-ধূপ, লালী, লাম্পাতিয়া প্রভৃতি বহুবিধ অপরিচিত বৃক্ষ নয়ন-পথে পতিত হইল। মধ্যে মধ্যে স্থমিষ্ট-ফল-প্রসূ কদলী বৃক্ষ ও শুভ্র এবং লোহিত পত্র-বিশিষ্ট পাদপ-শ্রেণী বনের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। পর্ব্বতের নিম্নভাগে নানাপ্রকার বন্য ও হিংস্র জন্তু বাস করে। হস্তী যূথে যূথে বিচরণ করে। ইতিমধ্যে এক দিন স্থকনা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বন হইতে কয়েকটী হস্তী রেলপথের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া শকট-গমনে বাধা দিয়াছিল। এখানে বড় ব্যাঘ্র, চিতা ও নেকড়িয়া ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ভল্লূক, বন্য-শূকর, কস্তূরী-মৃগ, কৃষ্ণসার বা সামর প্রভৃতি জন্তুরও অভাব নাই। গৌরী গাভী নাম্নী একপ্রকার গাভী 'তরাই' বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা স্থযোগ পাইলে মানুষের প্রাণ নাশ করে। কিয়দ্দূর উপরে উঠিলে দেখিবেন যে, নীল-গাভী, শ্রীগাভী, চামুরী গাভী

এবং নানাবিধ বৃহদাকার ও ভয়ঙ্কর বৃষভ পালে পালে বিচরণ করিতেছে। অল্প পথ গিয়াই পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, আঁকা বাঁকা হইয়া, এক শৃঙ্গ ছাড়িয়া অপর শৃঙ্গ বেষ্টন করত, রেলপথ উর্দ্ধাভিমুখে গমন করিয়াছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কি অত্যাশ্চর্য্য মনুষ্যের শিল্প-কৌশল! লৌহ-বর্ত্মটী পর্ব্বতের মেখলা-সদৃশ শোভা পাইতেছে। পর্ব্বত-শৃঙ্গের কটিদেশ বেষ্টন করিয়া, বাষ্পীয় শকট হেলিয়া দুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কখন অগ্রবর্ত্তী, কখন পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। কিন্তু কি নিপুণতা! কি অদ্ভুত শকট-চালনা! ক্রমেই আমরা পর্ব্বত-শৃঙ্গের উচ্চতর দেশে আরোহণ করিলাম। কখন বক্র, কখন চক্রাকার, কখন ঋজুভাবে শকট চলিতেছে। এক এক বার গাড়ী এরূপভাবে ঘুরিয়া চলিল যে, হঠাৎ মনে হইল, এঞ্জিন্‌খানি বুঝি 'ব্রেকভানে' উৎপতিত হইবে। রেলপথের এক পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, অপর পার্শ্বে অতল গিরি-গহ্বর। গহ্বরের দিকে দৃষ্টি করিলে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। আশঙ্কা হয়, অনতিবিলম্বে বাষ্পীয় শকট তন্মধ্যে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। পর্ব্বতের

দিকে দৃষ্টি করিলে ভয় হয় যে, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিপতিত হইয়া, শকট ও শকটারোহী সকলকেই ধূলিসাৎ করিবে। কিন্তু ধন্য মনুষ্যের বুদ্ধি-বল! ধন্য মনুষ্যের নির্ম্মাণ-কৌশল! এই অগম্য ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালার উপর দিয়া শকটাবলী অনায়াসে গমন করিতে লাগিল, কোনও বিঘ্ন ঘটিল না। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে মন হইতে ভয় দূরীভূত হইল। পর্ব্বত-শৃঙ্গের প্রাকৃতিক গঠনের পারিপাট্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলাম, পাদপ-শ্রেণীর ও লতা গুল্মাদির শোভা দেখিয়া অবাক্ হইলাম। নির্ঝর-জল-পতনের সুমধুর কল কল ধ্বনি, শ্রবণ-কুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিল। হৃদয় উল্লাসে বলিয়া উঠিল, কি বিশ্ব-উন্মাদকারী অতুল সৌন্দর্য্য! কি জগৎ-সম্মোহন অপার মহিমা! কি অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য রচনা! এই পাষণ্ড হৃদয়ও ভক্তিরসে প্লাবিত হইল। 'তিন-ধাড়িয়া' ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া, 'পাগলা-ঝোরা'-নামক নির্ঝর দেখিতে পাইলাম। তথায় প্রবল বেগে পর্ব্বত বহিয়া জল পড়িতেছে। বর্ষাকালে এই স্থানে মধ্যে মধ্যে শিলাখণ্ড পতিত হইয়া গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মায়। ক্রমে গাড়ী করশিয়ং ষ্টেশনে

উপনীত হইল। তখন বুঝিলাম যে, আমরা প্রায় ৫০০০ হাজার ফিট্ উচ্চে উঠিয়াছি। দেশে ২৫ ফিট্ উচ্চ প্রাসাদোপরি উঠিয়া মনে করি যে, সূর্য্য-দেবের নিকটস্থ হইবার আর বিলম্ব নাই ; কি ভয়ানক কথা, ৫০০০ হাজার ফিট্ উপরে উঠিয়াছি, অথচ যেরূপ ভাবে বসিয়াছিলাম, সেই ভাবেই বসিয়া আছি ! মনে মনে ইংরেজ জাতিকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলাম, তাহাদের বুদ্ধি বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিলাম। হঠাৎ হৃদয়ে শোক-তরঙ্গ উঠিল। ভাবিলাম, হতভাগ্য ভারতসন্তান কস্মিন্ কালেও স্বাধীনতা-রত্ন পুনঃ প্রাপ্ত হইবে না। এই প্রভূতবলশালী ও প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন জাতিকে বলদ্বারা পরাভব করিয়া স্বত্বাধিকার উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আকাশের তারকা গণনা, বালুকার রজ্জু নির্ম্মাণ এবং পর্ব্বত-তল হইতে স্রোতঃস্বতীকে পর্ব্বতশৃঙ্গাভিমুখে প্রবাহিত করা ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে সহজ ব্যাপার। মনের বিষণ্নতা-ভাব কষ্টে দূর করিলাম। “যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি” এই মহৎ বাক্য হৃদয়ে ক্রমে শান্তি-স্থাপনা করিল। করশিয়ং ষ্টেশনটি দেখিতে মন্দ নহে। এখানে আসিষ্টাণ্ট ডিপুটী কমিশনরের আফিস

ও অনেকগুলি চা-করের বাড়ী ও দোকান-ঘর আছে। দার্জ্জিলিঙ্গে শীতাধিক্য বলিয়া অনেক শৈল-বিহারী এই স্থানে বাস করেন। ইহার পরেই ক্লারেন্‌ডন হোটেল ষ্টেশন। একটী বৃহৎ হোটেল এই স্থানে আছে। উহা সাহেবগণের মধ্যাহ্ন-ভোজনের স্থান। প্রায় আধ ঘণ্টা কাল এখানে গাড়ী অপেক্ষা করিল। গাড়ী থামিবামাত্র, সাহেব ও মেম সাহেবগণ, লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন এবং হর্ষোৎফুল্লমনে হোটেল-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে কাঁটা ও ছুরি পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বদনবিনির্গত 'চপ্‌' 'চপ্‌' শব্দ গিরিগহ্বরে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রা-গতা প্রতিধ্বনি-সুন্দরীকে জাগাইয়া দিল। শ্বেতাঙ্গ-গণ উদর পূর্ণ করিয়া সানন্দে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট-লিপি স্বতন্ত্ররূপ। দুর্গন্ধময় কৃষ্ণবর্ণ পুরী ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট মিষ্টান্ন লইয়া কয়েক জন পাহাড়িয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আমা-দের শকট-দ্বারে উপনীত হইল। তাহাদের গাত্র-বস্ত্রের দুর্গন্ধে মাতৃদুগ্ধ পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িবার উপ-ক্রম হইল; কিন্তু জঠরানলের অসহ্য জ্বালায় সেই আহারীয় দ্রব্যই সুধা-জ্ঞানে উদরজাত করিলাম।

উপায়ান্তর-বিহীন নরের অসাধ্য কিছুই নাই। পরে, ক্রমে ঘুম পাহাড়ে উঠিলাম। ঘুম ষ্টেশন, দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রায় তিন শত ফিট্ উপরে। এখানে বিলক্ষণ শীত। দার্জ্জিলিঙ্গে যে জলের কল আছে, তাহায় জল সোণাদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ঘুম পাহাড় হইতে নীত হয়। অপরাহ্ণ ৬৷৷০টার সময়ে আমরা দার্জ্জিলিঙ্গে পঁহুছিলাম। আমার কয়েকটী বন্ধু, আমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 'লোকনগর'-নামক স্থানে, মহিষাদলের রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গরি মহাশয়ের একটী বাটী আছে, তথায় আমার বাসা স্থির হইয়াছিল। তজ্জন্য আমরা লোকনগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সাত জন স্ত্রীলোক কুলি, আমাদের দ্রব্যাদি লইয়া চলিল। স্ত্রীলোক কুলিকে এখানে 'নানী' বলে। একজন 'নানী' দুই তিন মণ বোঝা অনায়াসে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যায়। চুপ্‌ড়ির মত একটী সামগ্রী ইহাদের পৃষ্ঠে থাকে, তদ্দ্বারা ইহারা ভার বহন করে। ঐ জিনিসটীকে 'ডোকো' বলে। বুনানি করা চটার দ্বারা ডোকো কপালে আটকান থাকে। এই বন্ধনীর নাম নামলো। ডোকো ও নামলো বংশনির্ম্মিত। বাঁশকে ইহারা মালিং বলে।

বোঝা যতই ভারী হউক না কেন, তাহা কেবলমাত্র ঘাড়ের বলে পৃষ্ঠদেশে লম্বমান থাকে। ধন্য নানী-দের ঘাড়! অনেক দূর নিম্নে গিয়া লোকনগর প্রাপ্ত হইলাম। গিন্নি বড়ই বিরক্ত হইলেন। অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি কোথায় আনিলে? এ যে তরাই প্রদেশ! আবার কি আমরা শিলিগুড়িতে আসিলাম?" ছেলেরা ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করিয়া উঠিল। মিষ্টান্ন আনিবার জন্য একটী লোক উপরে গিয়া দুই ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিল। এই দুই ঘণ্টা কাল যেরূপ কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসে বুঝিতেছেন। চারিটী অবোধ শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছিল; তন্মধ্যে দুইটী নিদ্রিত হইয়া পড়িল, অপর দুইটী অবসন্ন হইল। গিন্নি বলিলেন, "অদ্যই এখান হইতে স্থানা-ন্তরে চল, নতুবা কল্য আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাইব।" আমিও বুঝিলাম, লোকনগর বাটীতে বাস করিলে কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। লোকনগরের অবস্থা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে প্রাণান্তেও তথায় যাইতাম না। সমস্ত রাত্রি মুষলধারায় বৃষ্টি হইল। পর দিবস প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই উপরে উঠিলাম।

তখনও বৃষ্টি হইতেছিল। অগত্যা 'দাণ্ডির' আশ্রয় লইতে হইল। দাণ্ডির আকৃতি অনেকটা 'তানজামের' ন্যায়। একখানি ইজি চেয়ারের সম্মুখে ও পশ্চাতে কাষ্ঠদণ্ড সংযুক্ত করিলে প্রায়ই দাণ্ডির আকার ধারণ করে। সচরাচর তিন জন বাহকে দাণ্ডি বহন করে, কিন্তু অধিক উপরে উঠিতে হইলে এবং আমার মত স্থূলকায় আরোহী হইলে চারি জন বাহকের প্রয়োজন হয়। এখানকার কুলির ঘাড় ও দাণ্ডি-ওয়ালার পা অদ্ভুত পদার্থ। কি অতীব বল-ব্যঞ্জক অস্থি ও মাংসপেশী! উপরে উঠিয়া ডিপুটী কমি-শনরের হেড ক্লার্ক বাবু হরিলাল গোস্বামীর সাহায্যে 'সাউথ ভিউ' নামক বাড়ী ভাড়া করিলাম। হরি-লাল বাবুর সহিত আমার কখন সাক্ষাৎ ছিল না, কিন্তু ইনি পরম বন্ধুর ন্যায় উপকার করিয়াছেন। বেলা দুই প্রহরের সময়ে সাউথ ভিউ গৃহে প্রবেশ করি-লাম। সমস্ত বিষয় ঠিক ঠাক করিতেই সে দিবসটী অতিবাহিত হইল।

দার্জ্জিলিঙ্গের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

দার্জ্জিলিঙ্গের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে দুই চারি কথা আপনার গোচর করিতেছি। যাহা লিখিতেছি, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন; কিন্তু স্বত্বের পরিচয় না দিলে আর্জ্জি অস্পষ্টতা-দোষাশ্রিত হয় এবং উকীল লেখকের রচনায় এপ্রকার দোষ মার্জ্জনীয় নহে; তজ্জন্য, যে প্রকারে এই জেলাটী ইংরেজ-করতলস্থ হইয়াছে, তাহার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

দার্জ্জিলিঙ্গের প্রাচীন নাম 'দর্জ্জেলামা'। দর্জ্জে বলিয়া এক জন লামা এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়া ভুটিয়ারা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিত, এখনও দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে। এখানকার কাছারির অনতিদূরে একটী গুম্ফা (পর্ব্বতগুহা) আছে, ভুটিয়ারা তথায় মধ্যে মধ্যে সমবেত হয় এবং মহাকালের উপাসনা করে। সন্ন্যাসীরাও তথায় সময়বিশেষে আগমন করেন। ভুটিয়ারা বলে যে, ঐ গুম্ফা দিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরী পর্য্যন্ত যাওয়া যায় এবং লামাগণ মধ্যে মধ্যে

তদ্দ্বারা গমনাগমন করেন। এখানে আর একটী প্রবাদ আছে যে, নেপালের 'ফুন-সো-লামগে' নামক এক রাজার রাজত্ব সময়ে এই স্থানে লামা-সরাই বা গুম্ফা নির্ম্মিত হয়। লামাগণ এই স্থানটীর 'দার্জ্জিলিঙ্গ' নাম প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন যে, দুর্জ্জয়-লিঙ্গ শিবের নাম হইতেই দার্জ্জিলিঙ্গ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গ শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ এই—দ = প্রস্তর, রজে = শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গ = স্থান বা প্রদেশ, অর্থাৎ পবিত্র গুম্ফা বা লামাদিগের চিহ্নিত স্থান। দার্জ্জি-লিঙ্গ শীতপ্রধান স্থান এবং অতীব স্বাস্থ্যকর। সুবি-মল বায়ুর লঘুতা এবং নির্ঝর-জলের পরিপাক-শক্তি-উত্তেজক গুণ থাকায় এখানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই রোগশূন্য। কেবল গলগণ্ড-দেবের পরাক্রমের পরি-চয় কোন কোন মনুষ্যের গলদেশে পাওয়া যায়। এই জেলাটী পূর্ব্বে শিকিমাধিপতির রাজ্যভুক্ত ছিল। গুরখা-নৃপমণি পৃথ্বীনারায়ণ অসাধারণ বাহুবলে নেপা-লাধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে স্বরাজ্য বিস্তার করেন। উত্তরে হিমালয়-প্রান্তে তিব্বত ও চীন রাজ্যের কিয়দংশ ও দক্ষিণে ত্রিহুত ও শারণ জেলা পর্য্যন্ত স্থান ক্রমে তাঁহার অধিকারস্থ হয়। শিকিমাধিপতি

রাজ্যচ্যুত হইয়া ইংরেজগণের শরণাপন্ন হন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, লর্ড ময়রার রাজত্ব-সময়ে, নেপালের সহিত ইংরেজগণের যুদ্ধারম্ভ হয়। গুরখাধিপতি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ইংরেজ সেনাপতি সার ডেবিড অক্টরলনির সহিত সন্ধি-স্থাপনা করেন। ঐ সন্ধিমূলে শিকিম ও তাহার দক্ষিণাংশ ইংরেজাধীনে আইসে; এবং ইংরেজগণ শিকিমরাজ্য উহার প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে প্রদান করেন। কলিকাতা মহানগরীতে যে 'মনুমেণ্ট' দেখিতে পান, তাহা এই ইংরেজ সেনাপতির স্মরণার্থ সমাধিস্তম্ভ। এই সময় হইতে শিকিম মিত্ররাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। ১৮৩৪ সালে রাজ্যসীমা লইয়া পুনরায় নেপাল ও শিকিমে বিবাদারম্ভ হয়। মেজর লয়েড সাহেব, গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের প্রতিনিধি স্বরূপে ঐ বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন এবং শিকিমরাজকে বিশেষপ্রকারে বুঝাইয়া দেন যে, ইংরেজ-রাজ-প্রতিনিধি দার্জ্জিলিঙ্গের উৎকৃষ্ট জলবায়ুর গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙ্গ প্রদান করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। তদনুসারে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে শিকিমাধিপতি ইংরেজদিগকে দার্জ্জিলিঙ্গ-

পার্ব্বতীয়াংশ প্রদান করেন। যে নিদর্শন-পত্র-মূলে এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ইংরেজাধিকার-ভুক্ত হয়, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—"দার্জ্জিলিঙ্গ শীত-প্রধান দেশ ও ইহার জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর বিধায় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ইহা অধিকারেচ্ছু হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণ পীড়িতাবস্থায় পর্ব্বতাশ্রয়ে স্বাস্থ্যলাভ করিবে বলিয়া আমি শিকিমাধিপতি, গবর্ণর জেনেরলের বন্ধুতার বশবর্ত্তী হইয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এতদ্দ্বারা দার্জ্জিলিঙ্গ অর্থাৎ বড় রঙ্গীত নদীর দক্ষিণ, কালিয়াল, রুষী (বালাসন) এবং ছোট রঙ্গীত নদীর পূর্ব্ব, রংনায়ু নদী এবং মহানন্দা নদের পশ্চিম অংশ বিনির্ণীত ভূমিখণ্ড প্রদান করিলাম।" মেজর লয়েড সাহেবের বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে ইংরেজদের দার্জ্জিলিঙ্গ লাভ হয়। লয়েড সাহেবই হিল কার্ট রোড নির্ম্মাণ করেন। তিনিই সিঞ্চল পাহাড়ের উপরে সৈনিক-শিবির সংস্থাপন করেন এবং তাঁহার যত্নেই ভূম্যাদির বন্দোবস্ত হইয়াছিল ও বিচারালয়াদি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ সালে এই মহাশয়ই নেপাল-রাজের সহিত বন্ধুতা করিয়া বালাসন ও ছোট রঙ্গীত নদীর পশ্চিমাংশের ও মেচী নদীর

পূর্ব্ববাংশের ভূমিখণ্ড প্রাপ্ত হন।* এখন দার্জ্জিলিঙ্গ একটী সুবিখ্যাত ও সুখজনক জনপদ বলিয়া বিখ্যাত। উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহা বঙ্গ-প্রদেশাধিপতির গ্রীষ্ম ঋতুর রাজধানী। এই শৈল-নিবাস-জন্য রাজকোষ হইতে বৎসর বৎসর বিপুল অর্থ বহির্গত হয়।

দার্জ্জিলিঙ্গ জেলা দুই ভাগে বিভক্ত, একাংশ পার্ব্বতীয়, অপরাংশ তরাই বা পর্ব্বততল। তরাইকে এদেশবাসিগণ "মোরং" বলে। মোরং নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। আমি দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না, সাধ্যও নাই। কয়েক দিবস এই নগরীতে নিবাস করিয়া যাহা দেখিয়াছি ও জানি-

---

* ১৮৫০ খৃঃ অব্দে 'তরাই' বিভাগ এবং পার্ব্বতীয় বিভাগের কিয়দংশ শিকিম-রাজ-হস্ত হইতে ইংরেজগণ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ভুটিয়াদের সহিত যুদ্ধের পর ১৮৬৫ সালে বৃটিশ ভুটান নামক স্থান ইংরেজগণ প্রাপ্ত হন। দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার বিস্তৃতি ১১৬৪ বর্গমাইল। এই জেলায় দুইটী নগর ও ১৩১৭টী গ্রাম আছে। ১৮৯১ সালের লোকগণনায় ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ২,২৩,৩১৪ জন স্থিরীকৃত হয়। তন্মধ্যে হিন্দু ১,৭১,১৭১, মুসলমান ১০,০১১, বৌদ্ধ ৪০,৫২০, খৃষ্টান ১,৫০২, জৈন ৮০, শিখ ২৭ এবং পার্শি ৩ জন।

য়াছি, তাহাই আপনাকে জানাইতেছি। ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন কি না, জানি না।

একটী সঙ্কীর্ণ পর্ব্বতাংশোপরি এই নগরটী সংস্থাপিত। ইহার সংলগ্ন শৃঙ্গত্রয় হইতে নিম্নতল সাতিশয় ঢালু। নিজ দার্জ্জিলিঙ্গ ষ্টেশন, সমুদ্র-সমতল হইতে ৭১৬৬ ফিট্ উচ্চ। দুই এক জন ইংরেজের মুখে শুনিয়াছি যে, এই নগরে ও লণ্ডন নগরে প্রায় একই ভাবে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর আবির্ভাব হয়।

বাজার।

১৬ই জুন রবিবার।—এখানে রবিবারে হাট হয়। সাহেব, মেম, নগরবাসী ভদ্রাভদ্র, সকল শ্রেণীর লোকই হাটে গিয়া এক সপ্তাহের উপযোগী আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। আমিও মহাজন-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিলাম। বেলা ৭টার সময়ে হাটে গমন করিলাম। হাটটী মিউনিসিপ্যালিটীর। একটী বড় ঘর আছে, তথায় নানা রকমের মাংস ও শাক সবজী বিক্রয় হয়। ঐ ঘরের সম্মুখে ও রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক দোকানী পশারী বসিয়া নানাবিধ দ্রব্য, ছাগ মেষাদি পশু,

এবং কুক্কুট কপোত ও হংসাদি পক্ষী বিক্রয় করিতেছে। হাটে প্রায় সকলপ্রকার খাদ্য-দ্রব্যই পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ম্মূল্য। সুলভের মধ্যে 'কপি', 'মটরের সুঁটী' ও শাক। একটা বড় বাঁধা কপির মূল্য ৵০ আনা। মটরের সুঁটী ।/০ আনায় এক সের। এক সের মৎস্যের মূল্য ৸৵০, ১৲ টাকা। কলিকাতা হইতে বরফের বাক্সে বদ্ধ হইয়া মৎস্য আইসে, এবং তাহাই এখানকার লোকে আগ্রহের সহিত খরিদ করে। মৎস্যে রক্তের সম্পর্কও নাই—দেখিলেই ঘৃণা হয়। জিয়ন্ত মৎস্যের মধ্যে কই, মাগুর ইত্যাদি। পাহাড়িয়া নদীতে মৎস্য পাওয়া যায়। শোল, বোয়াল, খরসুল্লা, রঙ্গী, উড়ন্ত, আগর ও রোহিত মৎস্য এখানকার নদীতে জন্মায়, কিন্তু প্রায়ই স্বাদহীন। দুই হস্ত লম্বা পুইডাঁটার মূল্য /০ এক আনা। এক পয়সায় ৪।৫টী ছোট কাঁচা আমড়া। শশাকে এখানে ক্ষীরা বলে। ক্ষীরা, কুমড়ার মত বড় ও মোটা হয়, একটীর মূল্য ১০ দেড় আনা। এখনও কমলা লেবু পাওয়া যায়। কমলাকে এ দেশে 'শান্তলা' বলে। শান্তলা বড়ই মিষ্ট, অসময় বলিয়া ফলগুলি শোলার মত হাল্কা ও মিষ্টতার অভাব হইয়াছে। নূতন গোল আলু উঠি-

য়াছে, দুই আনায় এক সের। এখানকার গোল আলু বড়ই সুস্বাদু। এখানে ভাল মিষ্টান্ন পাওয়া যায় না। সন্দেশ টাকায় এক সের। এক মণ কোক কয়লার মূল্য ১।৶০। কাঁচা কয়লা ৸৶০ আনায় এক মণ। কাঠের কয়লার মূল্য ১।০। জ্বালানি কাঠ টাকায় তিন মণ। ভাল চাউল ১০৲ টাকায় এক মণ। দুধ টাকায় /৫॥০ সের। এক সের ভাল মাখনের মূল্য ২॥০ টাকা। ডাইল প্রায় সিদ্ধ হয় না। পাকা ও কাঁচা আম্র বিস্তর। যতপ্রকার খাদ্য-দ্রব্য চক্ষে পড়িল, সমস্তই কিছু কিছু ক্রয় করিলাম। দুই জন নানীর পৃষ্ঠে জিনিস বোঝাই করিয়া বাসায় আনিলাম, এবং এক একটী করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিন্নির নিকট হইতে বিলক্ষণ প্রশংসা প্রাপ্ত হইলাম।

বোটানিকেল গার্ডেন।

আমাদের বাসা হইতে বোটানিকেল গার্ডেন বেশী দূরে নহে। বৈকালে তথায় বেড়াইতে গেলাম। দার্জ্জিলিঙ্গের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতাধিত্যকায় রাঙ্গারুন নামক স্থানে 'বোটানিকেল গার্ডেন' ছিল। ঐ স্থানটী

নগর হইতে প্রায় এক হাজার ফিট্ নিম্নে এবং ছয় মাইল দূরে। মেজর লয়েড সাহেবের পুত্র মিষ্টার লয়েড সাহেব জেলখানার উপরে একটী বিস্তীর্ণ স্থান দিয়াছেন, তথায় আধুনিক উদ্যানটী প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই স্থানটী দেখিলে আনন্দের সীমা থাকে না, মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। নানাজাতীয় মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানটী আলোকিত করিয়াছে। ডালিয়া পুষ্পের সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। পাপড়িগুলি গাঢ় রক্তিম, মধুচক্রের ন্যায় স্তরে স্তরে স্থাপিত। বৃন্ত হইতে ফুলগুলি স্থলপদ্মের ন্যায় ঈষৎ হেলিয়া পবন-হিল্লোলে দুলিতেছে; কতই সুন্দর দেখাইতেছে। ডালিয়া ফুল নানাজাতীয়। একজাতীয় ডালিয়ায় সাদা ফোঁটা দেওয়া, তাহা দেখিতে অধিকতর সুন্দর। নানাজাতীয় বৃক্ষ, বহুতর তরু-রুহ (Orchids) ও লতা গুল্মাদি, এবং সহস্রাধিক-প্রকারের গিরিকুন্তল (Fern) দৃষ্টি করিলাম। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত বৃক্ষের নাম করিয়াছি, তদতিরিক্ত এলাচি, দারু-হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রবার-বৃক্ষ, বিলাতি সিডার, ফার, পাইন, লার্চ্চ, সাইপ্রেস প্রভৃতি বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। এ দেশে 'দে'-নামক একরূপ ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে,

তাহার ত্বকে কাগজ প্রস্তুত হয়। শিয়ালকাঁটার গাছের মত একরূপ গাছ আছে, তাহাকে 'পণিয়া' বলে, তাহা হইতে রেশমের ন্যায় সূত্র প্রস্তুত হয়। আনন্দিত-হৃদয়ে উদ্যানটী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পুষ্পের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলাম, লতা-বৃক্ষাদির শোভা দৃষ্টে অবাক্ হইলাম, চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বালক বালিকাগণ সঙ্গে ছিল, তাহারা ফুল দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, নানাবর্ণের মৎস্য দেখিয়া করতালি দিয়া হাস্য করিতে লাগিল। একটী আড়াই-বৎসর-বয়স্কা কন্যা আমার হাত ধরিয়া গদ্গদভাবে বলিল 'বাবা, দার্জ্জিলিঙ্গ বেশ, আমি বাড়ী যাব না, এইখানেই থাক্‌ব'। শুক্র, শনি দুই দিনই সে 'বাড়ী যাব' বলিয়া বড়ই কাঁদিয়াছিল; উদ্যানের সৌন্দর্য্যে সেও মুগ্ধ হইল। কিন্তু এ আনন্দ আমরা অধিকক্ষণ উপভোগ করিতে পারিলাম না। নিদারুণ বিধাতা নির্দ্দয় হইয়া প্রবলবেগে বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত উদ্যানটী পরিভ্রমণ করিতে, কি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে, পারিলাম না। বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া একাগ্রচিত্তে 'খাণ্ডব-দাহনে' প্রবৃত্ত হইলাম। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইল।

জলা পাহাড়।

১৭ই জুন সোমবারে আমরা জলা পাহাড়ে উঠিলাম। জলা পাহাড় ৭৮৯৬ ফিট্ উচ্চ। উঠিবার রাস্তা মন্দ নহে, কিন্তু আমার মত উচ্চোদর-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ঊর্দ্ধগমন একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। কি করিব, এক দাণ্ডি আরোহণে গিন্নি ও দ্বিতীয় দাণ্ডি আরোহণে আমি পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিলাম। চারি জন বিপুলবলশালী ভুটিয়া আমাকে অতি কষ্টে লইয়া চলিল। এখানে পুরুষে প্রায় দাণ্ডি আরোহণ করে না, বৃদ্ধ ও রোগীর ভিন্ন কথা। একটী স্থূলকায়, দৃশ্যতঃ বলিষ্ঠ, অনতিবৃদ্ধ পুরুষকে দাণ্ডিতে আরূঢ় দেখিয়া অনেকেই হাস্য করিল। যখন অন্য লোকের সহিত দেখা হয়, তখন আমি অন্যমনস্কের ন্যায় প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করি এবং আমাকে দেখিয়া লোকে হাসিতেছে, এ কথা মনকে বুঝিতে বারণ করি; কিন্তু মন বড়ই নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিয়াছিল, কিছুতেই বুঝে নাই। লোকের হাসি দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু হাঁটিয়া উঠিতে সাহস হয় নাই। উঠিবার সময়ে নিম্ন দিকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দে

পুলকিত হইলাম। সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া নগরটী কি মনোরমই দেখাইতেছিল! অনৃজু গিরি-শৃঙ্গ-গাত্রে উপর্য্যুপরি শ্রেণীবদ্ধ সুগঠিত হর্ম্ম্যমালা ও বক্রগতি বর্ত্মাদি অতীব আশ্চর্য্য দৃশ্য। আমার কবিত্ব নাই, রচনাশক্তি নাই। এ দুর্ব্বল লেখনী এ দৃশ্য বর্ণনা করিয়া আপনাকে বুঝাইতে অক্ষম। একবার এ দেশে আগমন করুন, স্বচক্ষে দেখুন, বুঝিবেন দার্জ্জিলিঙ্গ কি অপূর্ব্ব স্থান! ইহাকে দেব-নিবাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্রমে পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। সৈন্য-নিবাস নয়নগোচর হইল। সৈন্য-দিগের বাসের জন্য এখানে বহু উৎকৃষ্ট অট্টালিকা সরকারী ব্যয়ে, অর্থাৎ বঙ্গপ্রদেশ-নিবাসীর অর্থে, নির্ম্মিত হইয়াছে। সৈন্যের বাহুবলে এই বিশাল ভারত-রাজ্য অর্জ্জিত ও স্থাপিত হইয়াছে, সৈন্যের বাহুবলেই ইহা রক্ষিত ও শাসিত হইতেছে; সৈন্যের স্বাস্থ্য-রক্ষণ ও বর্দ্ধন জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বিত হওয়া বিচিত্র নহে। যাঁহারা সৈন্য-সম্বন্ধীয় ব্যয়ে আপত্তি করেন, তাঁহারা অদূরদর্শী ও স্বার্থপর। সুতরাং সৈন্য-নিবাস দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার সময়ে এখানে উপ-

নীত হইলাম। পদব্রজে সস্ত্রীক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এখানে জিনিস-পত্রের দোকান অতি অল্প ও সামান্য। একখানি মদের দোকান আছে। এই প্রাতঃসময়েও সৈনিক পুরুষগণ ঐ গরল গলাধঃকরণ করিতেছেন। এই দুষ্প্রবৃত্তি-উত্তেজক মাদক-দ্রব্য-পানে তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। দুই এক জন আরক্তিম-লোচনে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি নানাদেশীয় 'রমণী-মুখ' অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু আমার স্ত্রীর ন্যায় রূপবতী রমণী কখন আমার নয়ন-পথে পতিত হয় নাই; তজ্জন্য আমি চিন্তাকুল হইলাম। ভাবিলাম, এই রমণী-রত্ন লইয়া এ কুস্থানে অধিক বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত নহে। লোকে বলে "বলং বলং বাহুবলং, ন চ অন্যবলং বলং"; সৈন্যদের বাহুবলের অভাব নাই, তাহারা দুর্দ্দমনীয়; তাহারা অত্যাচার করিলে উপায়ান্তর নাই। 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই অতি সুন্দর উপদেশ-বাক্যটীর অনুসরণ করিলাম। ফিরিয়া যাইবার সময়ে এখানকার চৌরাস্তা দেখিলাম। কলিকাতার গড়ের মাঠ এবং দার্জ্জিলিঙ্গের চৌরাস্তা উত্তম

বেড়াইবার স্থান। সকল বর্ণের সকল শ্রেণীর লোক এখানে বেড়াইতে আইসে। ইংরেজ-ললনা চৌরাস্তার বড়ই পক্ষপাতী। কোন রমণী অশ্বপৃষ্ঠারূঢ়া হইয়া সহাস্যবদনে অশ্ব-চালনা করিতেছেন, কেহ 'বিচিত্র-বিনোদ-বস্ত্রে' আবৃতা হইয়া দাণ্ডি আরোহণে বিচরণ করিতেছেন, আবার কোন শুভ্রাঙ্গনা মাংস-বিবর্জ্জিত সুদীর্ঘ হস্তে রেশম-নির্ম্মিত আতপত্র ধারণপূর্ব্বক ঘন ঘন পাদবিক্ষেপ করিতেছেন। লেপ্‌চা-রমণীগণ, নবনীতনির্ম্মিত সুদর্শন ইংরেজ-শিশু লইয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কোন বালক পারাম্বুলেটরে উপবিষ্ট হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ননীর পুত্তলী বালক বালিকাদিগকে বড়ই ভাল লাগিল। একটী হৃষ্টপুষ্ট বালক দেখিয়া মনে হইল চার্লস্ ল্যাম্ব (Charles Lamb) সাহেব বড়ই সারগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। এই বালকটীকে রোষ্ট (Roast) করিলে, আহারে অপূর্ব্ব তৃপ্তি জন্মে। 'রোষ্টের' কথা মনে উদয় হইবামাত্র জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল; বেগে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম, এবং প্রাণপণে উদর পূর্ণ করিয়া নিদ্রা-দেবীর কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিলাম। বৈকালে বড়ই বৃষ্টি হইল।

মহাকাল পাহাড়।

১৮ই জুন বৈকালে মহাকাল-শৈল-শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে অবজারভেটরি হিল (Observatory Hill) বলে। জলা পাহাড় অপেক্ষা ইহার উচ্চতা কম বটে, কিন্তু উঠিবার রাস্তা তত ভাল নহে। এ পাহাড়েও দাণ্ডি আরোহণে উঠিতে হইল। আমার একটী বাহাদুরীর কথা বলিতে ভুলিয়াছি। জলা পাহাড় হইতে নিম্নে আসিবার কালে পদব্রজে আসিয়াছিলাম। তখন শরীরের স্থূলতা প্রতিবন্ধকতা না করিয়া বিশেষ সাহায্যই করিয়াছিল। কুষ্মাণ্ডবৎ গড়াইতে গড়াইতে বেগে নিম্নে আগমন করিয়াছিলাম। মাধ্যাকর্ষণের অনুকম্পায় দাণ্ডিওয়ালারাও আমার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। মহাকাল শৈল হইতেও দার্জ্জিলিঙ্গ নগর দেখিতে পরম প্রীতিকর। এই পর্ব্বতে উঠিয়া শুনিলাম যে, কয়েক দিবস পূর্ব্বে এখানে ৬।৭ জন যোগী আগমন করিয়াছিলেন এবং মহাকালের আরাধনান্তে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুষ্প ও ভস্ম দেখিয়া বুঝিলাম, কথাটী অপ্রকৃত নহে। শৃঙ্গোপরি একখানি প্রস্তরে একটী ত্রিশূল

প্রোথিত আছে। ভুটিয়ারা বলে যে, এই স্থানে শিবের বিবাহ হয় এবং ত্রিশূলটী তাঁহার হস্তে ছিল। এ স্থানটী অতি পবিত্র। এখানে একটী গুম্ফা আছে। কিয়দ্দূর নামিয়া গুম্ফাটী দর্শন করিলাম। পূর্ব্ব পত্রে এই গুম্ফার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। যোগি-গুরু মহাদেব এ প্রদেশে যে অবস্থিতি করিতেন এবং তিনি যে একজন কবি-কপোল-কল্পিত ব্যক্তি ছিলেন না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ এভারেষ্টের অপর নাম গৌরীশিখর। দার্জ্জিলিঙ্গের পশ্চিমে শিঙ্গালিলা নামক যে পর্ব্বত-শ্রেণী দেখা যায়, গৌরীশিখর তাহারই উপরিস্থিত। তিব্বতে এক পর্ব্বতমালা আছে, তাহাকে কপর্দ্দি বা 'শিবজটা' বলে। 'শিবলা-সঙ্কট' নামেও একটী পর্ব্বত আছে। নামগুলি শুনিলেই বুঝা যায় যে, মহাদেব ও পার্ব্বতীর নামে এই সমস্ত পর্ব্বত অভিহিত হইয়াছে। বুদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে এ দেশে শৈব ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এখনও লেপ্‌চারা মহাদেবকে 'চিরে-নজি' নামে উপাসনা করে এবং বলে যে তাঁহার স্ত্রীর নাম 'উমা দেবা'। মেচ জাতিও শিবের উপাসক। তাহারা শিবকে 'বথো' বলে। কেহ কেহ মহাকাল

নামও দেয়। কোচ জাতির ত কথাই নাই। রাজবংশী কোচেরা শিববংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, কুচনীপাড়াতে হাতিয়া-মেচ নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। কোচাধিপতি হাজুর কন্যা হীরার সহিত তাহার বিবাহ হয়। হীরা পরম রূপবতী ছিল। মহাদেব তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে উপগত হন এবং হীরার গর্ভে তাঁহার ঔরসে দুই পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে এক জনের নাম বিশ্ব। কুচবেহারের রাজগণ এই বিশ্ব-বংশীয়। শিবের কুচনীপাড়ার কথা আমাদের দেশীয় লোকের মুখেও শুনিতে পাই, কিন্তু আমার বোধ হয় এ প্রবাদটী সত্য-মূলক নহে। বিশ্ব কোচের পিতা এবং ত্রিকালজ্ঞ মহা-যোগী মহাদেব একই ব্যক্তি ছিলেন না। সম্ভবতঃ হীরা-হরণ-মানসে, কোন শৈব, আপনাকে শিব পরি-চয় দিয়া, হীরা ও তাহার স্বামীকে ভুলাইয়াছিলেন। যিনি কামনা-শূন্য হইয়া জন্ম মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হন বলিয়া প্রবাদ; যাঁহাকে অনন্ত, আদ্যন্ত-মধ্য-রহিত, জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া এককালে সমগ্র ভারত-বাসী অর্চ্চনা করিয়াছে; এরূপ ব্যক্তি যে সামান্য রমণী-রূপে বিমোহিত হইয়া তাহাতে উপগত

হইয়াছিলেন, এ কথা আদৌ সম্ভবপর নহে। আমার অনুমানের সত্যতার পোষকে দুই একটী কথা বলিতেছি। ভুটানের মধ্যে চিকনা নামে একটী পর্ব্বত আছে, হাতিয়ামেচ ঐ স্থানে বাস করিত এবং ঐ স্থানটীকেই কুচনীপাড়া বলে। চিকনা পর্ব্বতের অনতিদূরে আর একটী পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, তাহাকে হীরা-হরণকারী মহাদেবের কৈলাসপুরী ও বাসস্থান বলে। কিন্তু প্রকৃত মহাদেবের কৈলাসপুরী তিব্বত দেশে, চিকনা পর্ব্বত হইতে বহু দূরে। খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ব হইতে শৈব ধর্ম্ম এ দেশে প্রচলিত। বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে মহাদেব যে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহা নিঃসন্দেহ। কোচরাজ বিশ্ব, তাহার বহু শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং প্রকৃত মহাদেব যে তাঁহার জন্মদাতা নহেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। শাস্ত্রীয় প্রমাণও আমার অনুমানটীর সত্যতার পোষকতা করে। কোচেরা বলে, তাহারা ভঙ্গ-ক্ষত্রিয়। পরশুরামের ভয়ে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় পর্ব্বতাঞ্চলে পলায়ন করে, তাহাদের হইতেই কোচ জাতির উৎপত্তি। কিন্তু পরশুরামের জন্মের বহু পূর্ব্বে শিব-দুর্গার উল্লেখ শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নেপালে পশুপতিনাথ

নামক শিরমূর্ত্তি এখন পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছেন। উক্ত রাজ্যে একপ্রকার পিত্তলময় অঙ্গুরীয় পাওয়া যায়, তাহাকে পবিত্রী বলে। তাহাতে শিব, বৃষ ও ত্রিশূলের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে এবং রুদ্রাক্ষমালার সহিত তাহা গ্রথিত করিয়া সন্ন্যাসিগণ গলদেশে ধারণ করেন। এখানকার লামাদিগের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলেও প্রতীতি হয় যে, মহাদেব এ-দেশ-বাসীই ছিলেন। লামারা এখনও ডমরু, শিঙ্গা ও ত্রিশূল ধারণ ও পশু-চর্ম্মাদি পরিধান করেন এবং তুষার-মণ্ডিত পথে গমনাগমনের সময় গাভী ও বৃষভ পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। মহাদেবের ধ্যান অনুসারে তিনি ডমরু, শিঙ্গা ও ত্রিশূল হস্ত, বৃষভ-বাহন এবং বাঘাম্বর-ধারী। এক সময়ে শৈব ধর্ম্ম ভারতবর্ষের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উত্তরে হিমালয় ও তিব্বত, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে বেলুচী-স্থান, পূর্ব্বে ভারতের পূর্ব্ব সীমা ও ভারত-সাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত শৈব ধর্ম্ম বিরাজ করিত এবং এক্ষণেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য কোন দেশের আচার ব্যবহার কথিত লামাদের আচার ব্যবহারের সদৃশ নহে।

ভুটিয়াবস্তি।

১৯শে জুন মঙ্গলবার—প্রাতেই ভুটিয়াবস্তি দর্শনোদ্দেশে গমন করিলাম। স্থানটী নিম্ন, কিন্তু দেখিবার যোগ্য। ভুটিয়ারা তথায় বাস করে। তাহাদের বাসগৃহ অতি সামান্য এবং অপরিস্কৃত। এ জাতির আচার ব্যবহারাদির কথা পরে বলিব। একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্বিতল বুদ্ধ-মন্দির দেখিলাম। মন্দির-মধ্যে তিনটী দেবমূর্ত্তি আছে। মধ্যস্থিত মূর্ত্তির নাম 'বুদ্ধ-দেও' বা আদিবুদ্ধ। আদিবুদ্ধের বামে শাক্যসিংহের মূর্ত্তি। ইনি কলির বুদ্ধ। দক্ষিণের মূর্ত্তিটীর নাম শুনিয়াছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি। প্রতিমূর্ত্তিত্রয়ের সম্মুখে পঞ্চমুখ মহাদেবের মূর্ত্তি। তথায় একটী দীপ জ্বলিতেছিল; ভুটিয়ারা বলে যে উহা আপনা হইতেই প্রজ্বলিত ও নির্ব্বাপিত হয়। ভোট (তিব্বতীয়) ভাষায় লিখিত অনেকগুলি ধর্ম্মপুস্তক তথায় আছে; মন্দিরের পুরোহিত বা লামা মহাশয়কে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। বুদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে পুরোহিত মহাশয়কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; তাঁহার উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম

যে, এ বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, তাঁহার জ্ঞান তদপেক্ষা বেশী নহে। এই ধর্ম্মের বীজমন্ত্র "ওম্ মাণি পদ্মে হুম" বাক্যের অর্থ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে লামাটী বলিলেন—"রত্ন-শোভিত পদ্মাধিষ্ঠিত যে বুদ্ধ, তিনি আমার মঙ্গল করুন।" অধুনা আনি বেসান্ত ও কর্ণেল অল্‌কট্ থিওসফি নামক যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহারও বীজমন্ত্র ঐ, কিন্তু অর্থ অন্যরূপ; তাঁহারা বলেন যে, ইহার অর্থ এই—"মণি (দুর্লভ বস্তু) পদ্মে (হৃদয়রূপ পদ্মে) হুম (অধিষ্ঠিত আছে)।" লামাটীর নিকট হইতে আর অধিক কিছু জানিতে পারিলাম না। এখানে আসিয়া একটী নেপালী চাকর নিযুক্ত করিয়াছি, সে বাঙ্গলা ভাষা বলিতে ও বুঝিতে পারে। সে আমাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা পরস্পরকে বুঝাইয়া দিল। পুরোহিত মহাশয়ের মুখ দিয়া মদের গন্ধ নির্গত হইতেছিল। পাহাড়ে 'মাড়যো' নামে একপ্রকার ফল জন্মে, ভুটিয়াগণ তদ্দারা 'জাঁড' নামক মদ প্রস্তুত করে, এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহা পান করে। জাঁডের গন্ধ লামার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল।

পুরোহিতটীকে একটী মুদ্রা প্রদান করিয়া তথা হইতে বার্চ্চ হিল পাহাড়ের নিকট দিয়া 'লিবঙ্গ' নামক স্থান দেখিতে গেলাম। এখানে নূতন একটী সৈন্য-নিবাস নির্ম্মাণাভিপ্রায়ে পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপরিভাগ বহু-ব্যয়ে সম-তল-ভূমি করা হইয়াছে এবং দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম বিস্তারের আয়োজন হইতেছে। জলা পাহাড়ে বড় শীত। রুগ্ন সৈন্যদের পক্ষে জলা পাহাড় তত স্বাস্থ্যকর নহে, তজ্জন্যই এই দানসাগরের আড়ম্বর। এই স্থানটী দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ শিকিমাভিমুখে; যদ্যপি ইংরেজ মহোদয়গণের অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা তৎসাধনও সুকর হইবে। যখন কথা-প্রসঙ্গে শিকিমের উল্লেখ করা হইল, তখন শিকিমাধিপতির বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা আপনার গোচর করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। ইংরেজদের বিবেচনায় বর্ত্তমান শিকিমরাজ রাজ্যশাসন-কার্য্যে তাদৃশ পটু নহেন; তাঁহাকে উপদেশ দিবার ও সাহায্য করিবার জন্য ১৮৮৯ সালে মিঃ জে. সি. হোয়াইট্ সাহেবকে গব-

টুকের পলিটিক্যাল্ অফিসর্ নিযুক্ত করা হইয়াছে। রাজ্যশাসন-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ ইনি একটী প্রতিনিধি-সভা সঙ্ঘটিত করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ১৮৯২ সালে তিব্বত গমন করিতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পথিমধ্যে নেপালীদের হস্তে পতিত হন, এবং তাহারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া ইংরেজ-হস্তে অর্পণ করে। তদবধি তিনি কখন দার্জ্জিলিঙ্গে, কখন করশিয়ঙ্গে বন্দিভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। যদ্যপি তিনি ইংরেজগণের নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে স্বরাজ্য পুনর্ব্বার পাইতে পারেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সুমতির উদয় হয় নাই, সুতরাং বন্দিত্বও অপনীত হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'ছোদা নামগিয়াল' তিব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র চোটালকে ইংরেজগণ দার্জ্জিলিঙ্গে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন; সম্ভবতঃ কালসহকারে তিনি 'দলীপ'-প্রারব্ধ প্রাপ্ত হইবেন। শিকিম এই অল্প সময় মধ্যে ইংরেজহস্তে বহু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। শিকিমের সুবিধার জন্য ইরেজাধিকার পিডঙ্গ হইতে শিকিমান্তর্গত জলেপ পাস ও টঙ্গলুঙ্গ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে;

তিস্তা নদীর উপর লৌহ-সেতু প্রস্তুত হইয়াছে; এবং গন্টুক নগরে দুই কোম্পানী পদাতিক ইংরেজ সৈন্য এবং নাটঙ্গ নগরে এক কোম্পানী অশ্বারোহী সৈন্য শান্তিরক্ষার্থ স্থাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে শিকি-মের অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন।

রঙ্গীত নদী।

লিবঙ্গ হইতে দেখিলাম, দূরে রঙ্গীত নদী প্রবাহিত হইতেছে। শিকিমরাজ ১৮৩৫ সালে যে পার্ব্বতীয় প্রদেশ ইংরেজদিগকে দান করেন, তাহার উত্তর সীমা এই রঙ্গীত নদী। ভুটিয়ারা ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করে। ইহার জল বড়ই সুশীতল। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে নয় ক্রোশ দূরে এই নদী তিস্তা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অনেকগুলি নির্ঝর দেখিলাম। বর্ষাকালে সহস্র সহস্র নির্ঝর হইতে জল নির্গত হইয়া নদীনিচয়ে নিপতিত হয়। দূর হইতে নির্ঝরের জল গলিত-রৌপ্য-স্রোতঃ-সদৃশ প্রতীয়মান হয়। নির্ঝরকে এ দেশে 'ঝোরা' বলে।

কাক-ঝোরা।

দার্জ্জিলিঙ্গ নগরের মধ্যে 'কাক-ঝোরাটী' সর্ব্বপ্রধান। ইহাকে দেবী-ঝোরাও বলে। দার্জ্জিলিঙ্গের নিম্নে এক স্থানে কাক-ঝোরার জল প্রবল বেগে নিপতিত হইতেছে। এই জলপ্রপাতকে ইংরেজগণ "ভিক্টোরিয়া ফল" (Victoria Fall) বলেন। এখানে একটী প্রবাদ আছে যে, গৌরী দেবী এই স্থানে স্নান করিতেন। স্থানটী অতি মনোহর, বোধ হয় তুষারমণ্ডিত। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ঝোরা দেখিয়াছি, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নগর।

বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় নগরটী দেখিতে দেখিতে আসিলাম। কলিকাতার বড় বড় পণ্যজীবী এখানে শাখা পণ্যশালা সংস্থাপিত করিয়াছেন। লেড্‌ল কোম্পানী বস্ত্রাদি ও স্মিথ কোম্পানী ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন। বোভেক কোম্পানী নানাবিধ অলঙ্কার, চেন, ঘড়ি প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ সাজাইয়া

রাখিয়াছেন। এখানেও 'এক্স্‌চেঞ্জ' (Exchange) আছে। পূর্ব্বে স্বাস্থ্যের জন্য লোকে দার্জ্জিলিঙ্গ আগমন করিত, এখন ব্যবসায়-উপলক্ষে বহু সদাগর ও সামান্য দোকানদার প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিতেছে। কাশ্মীরের লোক, পশ্চিমের মাড়ওয়ারী, হিন্দুস্থানী, কাবুলের লোক, বঙ্গদেশবাসী, বিলাত-নিবাসী—সকল দেশীয় লোকই অর্থোপার্জ্জন-লালসায় এ নগরে পরিভ্রমণ করিতেছে। ছোট, বড় অনেক দোকান দেখিলাম। নগরের উচ্চতর স্থানে অনেকগুলি ভাল ভাল বাসগৃহ আছে। দিন দিন নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। স্কুল, ডিস্পেন্সরি, ধর্ম্মালয়, নাট্যশালা ও আমোদ-গৃহাদির অভাব নাই। ইডন্ সানিটেরিয়মের কথা বোধ হয় পূর্ব্বে শুনিয়াছেন। এই অট্টালিকাটী দেখিতে অতীব সুন্দর। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ১৭২৩৩৯৲ টাকা ব্যয় করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করেন এবং ইহা সাজাইবার জন্য ২৩৭৫০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হয়; তন্মধ্যে ১০০০০৲ টাকা বর্দ্ধমানাধিপতি প্রদান করেন; কিন্তু এদেশবাসীগণ এখানে স্থান পায় না। আমাদের জন্য সাধারণের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া লাউস্ সানিটেরিয়ম্ নির্ম্মাণ করা

হইয়াছে। কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের ভূমিখণ্ড ও রংপুর-নিবাসী রাজা গোবিন্দলাল রায় এতজ্জন্য ৯০০০০৲ টাকা দান করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কিছুমাত্র অর্থ-সাহায্য করেন নাই। নগর দেখিয়া বাসায় আসিলাম। এ দিন আর বাহির হই নাই।

জলদসঞ্চয় ও বারিপতন।

২০শে জুন বুধবার—প্রাতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিবস বৃষ্টি হইল। মধ্যে মধ্যে ছাড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু সে সময়ে নিবিড় কুজ্‌ঝটিকা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল। কাহার সাধ্য বাসা হইতে স্থানান্তরে গমন করে। এদেশবাসিগণ কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করে না। তাহারা বলে, কুয়াসা (Fog) অতি স্বাস্থ্যকর; বৃষ্টির জলে ভিজিলেও বিশেষ অসুখ হয় না। ঈশ্বর জানেন এ কথা সত্য কি না, আমরা কিন্তু বৃষ্টির সময় ঘরের বাহির হইতাম না। কয়েক দিবস ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হইল। সকলেরই বিরক্তি জন্মিল। দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। এখানকার

সকল সামগ্রীই অদ্ভুত। মেঘ-সমাগমও অপূর্ব্ব। মেঘ সর্ব্বদা নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে; কখন ঊর্দ্ধে, কখন পদতলে বিচরণ করিতেছে; কখন বা গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক গাত্র স্পর্শ করিতেছে। মেঘের লীলা অত্যাশ্চর্য্য। এক দিবস চিন্তাকুলহৃদয়ে বারান্দায় বসিয়াছিলাম, দেখিলাম—পদতলে মেঘ-সমাগম হইয়াছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদালোকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে। মনে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম, আমি ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ, জীমূত-বাহনে পরিভ্রমণ করিতেছি। পর্ব্বত-গহ্বরে বৃক্ষাদির অস্পষ্ট কৃষ্ণবর্ণ আকার দৃষ্টি করিয়া মনে করিলাম, নিম্নে ধরা-পৃষ্ঠে রামচন্দ্রের বানর ও ভল্লূকের কটক কলরব করিতেছে। ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া বাণবর্ষণমানসে হস্ত প্রসারণ করিলাম। তখন বুঝিলাম, আমি ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ নহি। কিন্তু একবারে ভ্রম দূর হইল না; মনে করিলাম, বুঝি ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির হইব; নতুবা এ স্বর্গ-রাজ্যে কিরূপে আরোহণ করিলাম? সামান্য মনুষ্য ত এখানে আসিতে পারে না। নির্ঝর-জল-পতনের মধুর কল কল ধ্বনি কর্ণ-গোচর হইল; ভাবিলাম এই যে, স্বর্গদ্বারে উপনীত হইয়াছি, দেবগণ

আমার আগমনে প্রীত হইয়া মঙ্গলধ্বনি করিতেছেন, অদূরে স্বর্গ-সঙ্গীত হইতেছে। আমি কল্পনা-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইহ জগৎ অতিক্রম করত জগদন্তরে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনারূঢ় দেবরাজ সহস্রলোচন ও তৎপার্শ্বাসীনা অতুল-রূপ-যৌবন-সম্পন্না শচী দেবীর রূপ-মাধুরী দর্শন করিতেছিলাম, দেব-সভাধিষ্ঠিত দেব-গুরু বৃহস্পতির কণ্ঠ-নিঃসৃত মঙ্গল-গাথা শ্রবণ করিতেছিলাম, নন্দন-কাননের মনোহর প্রসূনরাজির মুগ্ধকর গন্ধের আঘ্রাণ লইতেছিলাম, হঠাৎ আমার গুণবতী সহধর্ম্মিণীর প্রেমময় সম্ভাষণ শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "দেখ! দেখ! মেঘের কি অপরূপ মাধুরী! অনবরত বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া বিরক্ত হইও না, যাহার চক্ষু আছে, সে সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে পায়।" এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত হইল, অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল; ভক্তিভাবে বলিলাম "ধন্য জগৎপতি! অসীম তোমার মহিমা, অচিন্ত্য তোমার শক্তি, অপূর্ব্ব তোমার সৃষ্টি! মূঢ় সে, যে বলে এই অসীম-শোভা-সম্পন্ন জগতের সর্ব্ব-শক্তিমান্ স্রষ্টা নাই, নির্জীব জড়ের যোজনায় ইহার

উৎপত্তি হইয়াছে। মূঢ় সে, এই অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ দেখিয়া যাহার প্রতীতি না হয় যে, এই জগৎ-কৌশলের অসীম-গুণ-সম্পন্ন মঙ্গলময় কারণ বর্ত্তমান আছেন। অন্ধ সে, যে প্রতি পুষ্পে, প্রতি বৃক্ষে, প্রতি লতায়, প্রতি বনস্পতিতে, এক সর্ব্বমূলাধার পরম পুরুষের সত্তা উপলব্ধি না করে। অন্ধ সে, যে এই অপূর্ব্ব বিদ্যুদালোকে সেই নিষ্কলঙ্ক অতুল জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের বিমল জ্যোতি দেখিতে না পায়। বধির সে, যে নির্ঝরের কল কল ধ্বনিতে ঈশ্বর-গুণ-গান শ্রবণ না করে। বধির সে, যে এই মেঘগর্জ্জনে পরম-দয়ালু জগৎপিতার মধুর সম্ভাষণ শুনিতে না পায়। মুগ্ধ হইলাম, বিহ্বল হইলাম, জ্ঞান-চৈতন্য-রহিত হইলাম, ক্ষণকালের জন্য সেই অমৃত প্রেমময়ে নিলীন হইলাম। জ্ঞান-লাভান্তে দেখিলাম, হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়াছে, প্রেমে ডগমগ করিতেছে ; বিহ্বলাবস্থায় যে বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তখন তাহার অতুলনীয় মধুরত্বের পরিচয় পাইলাম। তখন বুঝিলাম, কি কারণে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-মুক্তি-লালসায় কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন ; তখন বুঝিলাম, নির্ব্বাণই জীবের পরা গতি, নির্ব্বাণই জীবাত্মার পরা মুক্তি।

বুদ্ধধর্ম্মোক্ত নির্ব্বাণ।

বুদ্ধদেবোক্ত নির্ব্বাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ দার্শনিক পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারেন নাই। জীবাত্মার নিধনকে মনুষ্যের পরা গতি ভাবিয়া বুদ্ধদেব সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কখনই বিশ্বাস্য নহে। নিধন-প্রাপ্তির জন্য কঠোর-ব্রতাবলম্বনের প্রয়োজন কি? ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কি? দার্শনিকগণ বুদ্ধদেবের প্রগাঢ় ভাব-রহস্য-ভেদে অক্ষম হইয়াই তাঁহাব মত অসার ও ভ্রমময় বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাঁহাকে নাস্তিক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন না, তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ-জ্ঞান-নেত্রে সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-যোগ-বলে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়াছিলেন; বুঝিয়াছিলেন যে, পরিমিত পদার্থে, অপূর্ণ স্বভাবে প্রেম-স্থাপন অজ্ঞান জীবের কার্য্য। তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, পরব্রহ্মে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি জীবাত্মার পার্থক্য

ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরে নিলীন হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বলিয়াছিলেন যে, নির্ব্বাণই জীবের মোক্ষপদ। চৈতন্য-দেবের মধুর প্রেমে ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণে পার্থক্য নাই। যে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি-লালসায় বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, চৈতন্য প্রভু ইহ জগতে সেই নির্ব্বাণের বিমল-সুখাস্বাদন করিয়া উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছিলেন। নির্ব্বাণ-ভাবটী অতি মহান্ এবং পবিত্র। এই ভাবটী পাঁচটী মহাসত্য-প্রতিপাদক। আমি যথা-সময়ে তাহার উল্লেখ করিব। আপাততঃ একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আমি যে অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহার করিতেছি, তাহা অধ্যয়নের ফল নহে, মস্তক বিলোড়িত করিয়া বুদ্ধি-প্রভাবেও তাহা আবিষ্কার করি নাই। যখন আমার স্ত্রী বলি-লেন যে,"যাহার চক্ষু আছে, সে সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে পায়," তখন আমার মনে হইল যে, উপ-নিষদে লিখিত আছে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে···তদ্‌বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি।" প্রকৃত পক্ষেই ধীর ব্যক্তি ঈশ্বরকে অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বত্র সকল ভূতে দৃষ্টি করেন। এই ভাবের উদয় হইলে সহসা নির্ব্বাণ-

বিষয়ে আমি যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাহাই আপনাকে জানাইতেছি। আমার প্রতি বুদ্ধ প্রভুর কৃপা হইয়াছিল, এ কথা বলিতে সাহস করি না, কিন্তু যেপ্রকার অলক্ষিতভাবে নির্ব্বাণের তাৎপর্য্য আমার মনে উদয় হইয়াছিল, তাহাতে বিশ্বাস হইতেছে যে, আমার কথায় সম্ভবতঃ ভুল নাই।

অনেক দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে, আত্মার বিধ্বংস-কেই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ বলিতেন; কেননা তিনি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন না, অস্তিত্ব পর্য্যন্তও স্বীকার করিতেন না। এ কথাটী আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। আমার মত সমর্থন জন্য বুদ্ধোক্ত কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিব, তৎপাঠে আপনি বুঝিবেন যে, আমি ভ্রমে পতিত হই নাই। একটী বাক্য এই—"চিন্তাশীলতা অমরত্ব-লাভের পথ"। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে নিকটে ডাকিয়া বলেন, "হে ভিক্ষুগণ! এ পৃথিবীর সমুদয় পদার্থই ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইয়া যায়; তোমরা পরিত্রাণের জন্য প্রাণপণে যত্ন কর। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবন ফুরাইয়া আসিল, আমার মৃত্যু সন্নিকট, আমি তোমা-দের নিকট বিদায় লইতেছি; তোমরা উৎসাহী, অনু-

রাগী, পবিত্র, ধ্যান-পরায়ণ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও, সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধায়ী হইয়া হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। যে একান্তমনে এই ধর্ম্মানুসরণ করিবে, সে জীবন-সাগর পার হইবে, তাহার সকল দুঃখ নির্ব্বাণ জলে ডুবিয়া যাইবে।” তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলেন, “সাধনে যত্নশীল হও, পাপ, মোহ ও অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা পাইবে।” মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সুভদ্রা-নামক একজন ব্রাহ্মণকে বুদ্ধদেব বলেন, “আমি তোমাকে সংক্ষেপে এই বলিতেছি, যে শিক্ষায় অষ্ট-মার্গের প্রতি সম্মান নাই, যাহাতে ধর্ম্মজীবনের সমাদর নাই, সে শিক্ষায় মানুষ কখন পরিত্রাণ পায় না।” অন্তিম কালে বলেন, “ভিক্ষুগণ, এই আমার শেষ কথা যে, মানব-দেহ ও শক্তি ক্ষণভঙ্গুর ; এই বাক্য প্রাণে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া পরিত্রাণের জন্য সচেষ্ট হও।” বুদ্ধদেব পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন এবং কর্ম্মফল মানিতেন। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না থাকিলে পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অনেক পণ্ডিত বলেন, বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন। রাইস ডেবিড, মোক্ষ মূলর, সেণ্ট হিলার, ফাইও

লেটর প্রভৃতি অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মে ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই। এ বাক্যটী ও ভ্রমাত্মক। 'বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন' ইহা না বলিয়া 'তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন' বলিলে অধিকতর সঙ্গত কথা হইত। বৌদ্ধপুস্তক হইতে আমার মতের পোষক কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়া আপনার গোচর করিতেছি। 'ললিত-বিস্তর'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন, "এই জনসমূহ আমার প্রতি প্রসন্ন, আমি ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে নিযুক্ত হইব। আমার এই ধর্ম্ম সকলেরই গ্রাহ্য হইবে। আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, আমার চরণে প্রণত হইয়া সকলেই এই ধর্ম্ম আমার নিকট প্রার্থনা করিবে।" * খৃষ্টান, মুসল-

---

* "ইয়ং পুনর্জ্জনতা প্রসন্ন ব্রহ্ম
তেন অধীষ্ট প্রবর্ত্তয়ি চক্রম্॥
এবঞ্চ অয়ু ধর্ম্ম গ্রাহ্য মে স্যাৎ,
স চ মম ব্রহ্মক্রমে নিপত্য যাচেৎ।
প্রবর্দতি বিরজা বিপ্রণীতধর্ম্মম্"...
ললিত-বিস্তর, ২৫ অধ্যায় (৫১০-৫১১ পৃষ্ঠা)।

মান, হিন্দু, শিখ, পার্শি, ইহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোকের একুন সংখ্যা প্রায় ৭৫ কোটি, কিন্তু একা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা হইতেছে ৫০ কোটি। দেখুন, বুদ্ধদেবের বাক্য প্রকৃত কি না? সকল লোকেই তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্ম-ভিক্ষা চাহিতেছে কি না? যে হিন্দুগণ বৌদ্ধ নহে, তাহারাও বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। সোণাণ্য নামক শিষ্যকে উপদেশ দিবার সময়ে বুদ্ধদেব বলেন যে, "প্রাচীন শাস্ত্র অথবা গুরূপদেশ-বলে আমি এ মহাসত্য লাভ করি নাই। আমি নূতন জ্ঞান, নূতন চক্ষু, নূতন বিদ্যা, নূতন মেধা ও নূতন আলোকে এ সত্য দর্শন করিয়াছি, পাইয়াছি, সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।" কোন্ নাস্তিক এ প্রকার বাক্য বলিতে সাহসী হয়? যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, যে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে না, যে নিধনকে জীবের চরম লক্ষ্য মনে করে, তাহার মুখ হইতে এপ্রকার কথা কখনই নিঃসৃত হইতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রাচীন নহে। খৃঃ অব্দের ২৫৭ বৎসর পূর্ব্বে মগধাধিপতি অশোকবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, উক্ত ধর্ম্ম সম্যগ্রূপে প্রচারকরণোদ্দেশে

পেশওয়ার হইতে উড়িষ্যার উপকূল পর্য্যন্ত ও দক্ষিণে কাটিওয়ার পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে স্তম্ভে, শৈলগাত্রে এবং গিরিগুহায় উক্তধর্ম্মানুমোদিত মত খোদিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসন প্রিন্সেপ্-নামক এক ইংরেজ দ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছে। সপ্তম অনুশাসনটী এই, "আমি পুণ্য-ক্রিয়া সংস্থাপন করিয়াছি। মানব-জাতি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মপথে নীত হইবে এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে।" আর একটী অনুশাসন এই, "অপরাধ স্বীকার কর এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনিই সম্মানের উপযুক্ত পাত্র।" অশোক রাজা অপর একটী অনুশাসনে বলিয়াছেন, "যদ্দারা পৃথিবীতে করুণা ও উদারতা, সত্য ও পবিত্রতা, দয়া ও সাধুতা বৃদ্ধি হয়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মভাব, তাহাই সকল ধর্ম্মোপদেশের সার।" এবংবিধ বহু বাক্য বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি ইতি-পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভুটিয়াবস্তিতে যে মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যস্থিত তিনটী মূর্ত্তির মধ্যে মধ্যস্থিত মূর্ত্তিকে 'বুদ্ধদেও' বা আদিবুদ্ধ বলে। আদিবুদ্ধ সম্বন্ধে নেপালীগণ বলে যে, "আদিবুদ্ধ অনাদি, তিনি পূর্ণ, পবিত্র এবং সত্য। তিনি অতীতদর্শী, তাঁহার

বাক্য অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ও সর্ব্বব্যাপী। তিনি বুদ্ধদিগের স্রষ্টা। তিনি প্রজ্ঞা ও জগতের স্রষ্টা, তিনি স্বয়ম্ভূ। তাঁহার ধ্যান হইতে তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর, তিনি অনন্ত; যে সমস্ত পদার্থ এখনও আকারশূন্য, তিনিই তাহাদের আকার।" 'কারণ্ড-ব্যূহ' ও 'নাম-সঙ্গীতি' নামক দুইখানি বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অতি প্রাচীন গ্রন্থে এইপ্রকার অনেক উক্তি আছে।

আপনার সহিত মকদ্দমা মামলার কথোপকথন উপলক্ষে আমি বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি যে, আপনি প্রমাণ আলোচনায় বিলক্ষণ পটু। তজ্জন্য অধিক বচনোদ্ধার নিষ্প্রয়োজন মনে করি। যাহা বলা হইল, তাহাতেই আপনি বুঝিবেন যে, বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। ইয়ুরোপীয় দার্শনিকগণ বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহাদের রীতি-নীতি, ধর্ম্মশিক্ষা, চিন্তাপ্রণালী ও সমালোচনা-রীতি অনুসারে তাঁহারা এ কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়াছেন। অনেকে বলেন যে, লঙ্কাদ্বীপ-নিবাসী বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী; সম্ভবতঃ এ কথাটী সত্য। "যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস"; এই রাক্ষস-

সমাজে পড়িয়া ঈশ্বর বেচারা মারা পড়িয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সারার্থ তাহারা উদরস্থ করিয়াছে।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নির্ব্বাণ শব্দ পাঁচটী মহাসত্য-পরিচায়ক। আমি যে কথাগুলি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা সম্ভবতঃ নূতন, আমি ত কোন পুস্তকেই তাহার উল্লেখ দেখি নাই। আমার মনের ভাব দুই চারি কথায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। যত সংক্ষেপে পারি, বলিব; দয়া করিয়া পাঠ করিবেন, বিরক্ত হইবেন না।

'নির্ব্বাণ' শব্দের ব্যাখ্যা।

যে পাঁচটী মহাসত্য নির্ব্বাণ-ভাবে অন্তর্নিহিত আছে তাহা এই—১। জগৎ-সংসারকে অনিত্য ও অপূর্ণ জ্ঞান। ২। চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা যোগ। ৩। পরমাত্মাকে নিত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞান। ৪। ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ততা। ৫। নিজের অস্তিত্ব-জ্ঞানের লোপ। এই ভাব কয়েকটীকে নির্ব্বাণ-মুক্তি-লাভের সোপান বলা যাইতে পারে। এই সোপানপঞ্চক অতিক্রম করিতে না পারিলে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি অসম্ভব।

১। জগৎসংসারকে অনিত্য ও অপূর্ণ জ্ঞান।—সকল পদার্থই ক্ষণিক, দুঃখময়, স্বলক্ষণাক্রান্ত এবং শূন্য। মেঘশ্রেণীর ন্যায় কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নহে; সুতরাং সংসার সকলের পক্ষেই দুঃখকর। জীবলোকে দুঃখ ও যন্ত্রণা সর্ব্বত্র ব্যাপী। যে এই অকিঞ্চিৎকর পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব মনে ধারণা করিতে অশক্ত, তৎপ্রতি তাহার ঘৃণার উদ্রেক হয় না। যাহাদের সংসারের অনিত্যতা-জ্ঞান নাই, তাহারা বহির্ব্বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করে এবং বিস্তীর্ণ মৃত্যু-পাশে আবদ্ধ হয়। এশ্রেণীর ব্যক্তি চিত্তসংযমে অক্ষম। কিন্তু যখন জীব বুঝিতে পারে যে, পৃথিবী জলবুদ্‌বুদ ও মরীচিকা সদৃশ, তখন সে ইহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তখন বহির্ব্বিষয়ের প্রতি তাহার স্নেহ, মমতা ও কামনা থাকে না, সে দ্বিতীয় সোপানে পদার্পণ করিবার উপযোগিতা লাভ করে। এই জন্যই বুদ্ধদেব নিজ শিষ্যদিগকে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা সম্যক্‌প্রকারে বুঝাইবার যত্ন করিয়াছিলেন।

২। চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা যোগ।—পাতঞ্জল দর্শনে যোগের বিষয় সম্যগ্‌রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ; চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। চিত্তবৃত্তির নানারূপ অবস্থা হয়। রজোগুণের উদ্রেক হইয়া চিত্তের যে অবস্থা হয়, তাহার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। এই অবস্থায় বাহ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মায় এবং তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি হয়। তমোগুণের উদ্রেক হইলে কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনা-শক্তি রহিত হয় ; এই অবস্থাকে মূঢ়াবস্থা বলে। সত্ত্বগুণের উদ্রেক-হেতু চিত্ত দুঃখ-সাধন সাধুবিগর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখ-সাধনীভূত সজ্জন-সেবিত আত্মোৎকর্ষজনক ব্রতাদি কার্য্যে অনুরক্ত হয়। এই অবস্থা চিত্তের বিক্ষিপ্তা-বস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ অবস্থাই সমাধি বা যোগের অনুপযোগী। কিন্তু একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাদ্বয় সমাধির বিশেষ উপযোগি। ঈশ্বর-বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা হইলে পর নিরোধাবস্থার উৎপত্তি হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তির ব্যাখ্যা করত তাহার নিরোধের উপায় বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধিত হয়। বৈরাগ্য বিষয়-বৈমুখ্য উৎপাদন করে ; বৈরাগ্যই দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষয়ে মনের বিতৃষ্ণা

জন্মায় এবং বুদ্ধিকে আপন বশীভূত করে। যাহার প্রকৃত বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়, তাহার চিত্তে কোনরূপ বৃত্তির সঞ্চার হয় না অর্থাৎ তাহার চিত্তবৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হয়। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত ও উপদেশ-বাক্য আলোচনা করুন, বুঝিবেন যে, তিনি পরম যোগী ছিলেন, তিনি চিত্তবৃত্তির নিরোধ-সাধন-মানসে কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন।

আপনার অবিদিত নাই যে, কপিলবস্তু নগরের রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে এবং কলিনগরাধিপতি অঞ্জনদেবের দুহিতা মহামায়ার গর্ভে, খৃঃ অব্দের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। তাঁহার নাম প্রথমতঃ সিদ্ধার্থ ছিল। পরে সিদ্ধ হইয়া তিনি বুদ্ধ নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার অপর দুইটী নাম ছিল, শাক্য মুনি ও গৌতম। যে প্রাভাতিক মঙ্গলগাথা শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, যাহার প্রভাবে তিনি মায়ার দুশ্ছেদ্য জাল ছেদন করেন, প্রাণাধিকা ভার্য্যা ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র এবং অতুল রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া ছিন্নবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক পরম-পুরুষার্থ-সাধন-কামনায় বনপ্রবেশ করেন,

একবার সেই গাথাটী স্মরণ করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, কিজন্য তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। গাথাটীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "এই ত্রিভুবন জরা, ব্যাধি ও দুঃখে প্রজ্বলিত, মরণাগ্নিতে প্রদীপ্ত ও অনাথ। কুম্ভগত ভ্রমরের ন্যায় মূঢ় জগৎ কোনমতেই ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে না। এই ত্রিভুবন শারদীয় অভ্রসম অনিত্য। এই জগতে জন্মমৃত্যু রঙ্গশালার নটসদৃশ। বেগবতী গিরিনদী-সম দ্রুতগামি মানব-জীবন আকাশস্থ বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। ভূলোকে ও দ্যুলোকে ভবতৃষ্ণার্ত্ত ও অজ্ঞানবশ জনগণ বিমূঢ়চিত্ত হইয়া কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় সর্ব্বদা ঘুরিতেছে। মৃগ যেমন প্রলুব্ধ হইয়া ব্যাধের জালে জড়িত হয়, সেইরূপ এই জগতীস্থ মানববৃন্দ সুন্দর রূপ, স্নিগ্ধ শব্দ, মনোহর গন্ধ, রস ও স্পর্শ-সুখে মোহিত হইয়া পাশবদ্ধ হইয়াছে। মৃত্যু পরম বৈরী ও ভয়ের কারণ, বাসনা বহু শোক ও উপদ্রবের মূল, ভোগ্যবস্তুসকল অসিধারসম বিষযন্ত্রনিভ, অতএব ইহা পরিত্যাগ কর। বাসনা-স্মৃতি শোককর, অজ্ঞানকারী, ভয়হেতু, দুঃখমূল, ভবতৃষ্ণালতার আশ্রয়।...জ্ঞানিগণ ইহাকে মিথ্যা-পরিকল্পনা-

সমুত্থিত বলিয়া জানেন।...বহু-রোগ ও ধন-ব্যাধি-দুঃখে এই জগৎ সর্ব্বদা জ্বলিতেছে; অতএব হে মুনে! এই জগৎ জরাব্যাধিগত দেখিয়া শীঘ্র ইহার দুঃখ-নিষ্কৃতির উপদেশ দাও।...নদীস্রোতে পতিত বৃক্ষের যেমন পত্র-ফল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ এই ভবসংসারে প্রিয় বস্তু ও প্রিয় জনের সহিত সর্ব্বদা বিচ্ছেদ হইতেছে, আর কাহারও সহিত পুনরায় মিলন হয় না, কেহ পুনরায় আগমন করে না; সকলেরই মরণ হইতেছে, পতন হইতেছে, পতন-কালের ক্রিয়া হইতেছে; মৃত্যু সকলকে বশীভূত করিয়াছে, কিন্তু কেহই মৃত্যুকে বশ করিতে পারে না। নদীস্রোত যেমন দারুখণ্ডকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত্যুও সেইরূপ সকলকে হরণ করে। জলবিহারী মকর যেমন জীবগণকে, গরুড় যেমন উরগকে, মৃগেন্দ্র যেমন গজকে, অগ্নি যেমন তৃণৌষধি ও প্রাণিগণকে গ্রাস করে, মৃত্যুও সেইরূপ শত শত প্রাণীকে কবলস্থ করিতেছে। অতএব তুমি পূর্ব্বে ঈদৃশ বহুদোষ-প্রপীড়িত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য যে প্রণিধান করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর, অভিনিষ্ক্রমণ করিবার তোমার এই প্রকৃত সময়।" এই গাথা শুনিয়া যাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়,

একটুকু ভাবিলেই বুঝিবেন যে, তিনি চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কি না। এই গাথা শ্রবণ করিবার কয়েক দিবস পরে সিদ্ধার্থ একজন শান্তমূর্ত্তি পুরুষকে দেখিয়া নিজ সারথি ছন্দককে জিজ্ঞাসা করেন, "এ ব্যক্তি কে ?" সারথি বলে, "এ ব্যক্তি ভিক্ষু। ইনি সংসারের সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহাঁর আচরণ সুবিনীত; ইনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন, সকলকে আপনার তুল্য দর্শন করেন, রাগ দ্বেষ পরাজয় করিয়াছেন, ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া গৌতম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ ভিক্ষুর পথ অবলম্বন করিবেন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মানবকুলকে অধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করিবেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার সময়ে তাঁহার সারথিকে বলেন যে, "ভোগ-বিলাসে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও আমি তাহাতে নির্লিপ্ত আছি। জীবের দুঃখ সহ্য করিতে পারি না, তজ্জন্য সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতেছি। এই ভবসমুদ্র নিজে উত্তীর্ণ হইয়া জগৎকে উত্তীর্ণ হইবার পথ প্রদর্শন করিব। নিজে মুক্ত হইয়া চরাচর বিশ্বের মুক্তির পথ অর্গলশূন্য করিব।" সন্ন্যাসী হইয়া

তিনি প্রথম ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। কত শীত, কত রৌদ্র, কত বৃষ্টি তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার যোগ-ভঙ্গ হয় নাই। তিনি তপস্যা-প্রভাবে ইন্দ্রিয়-বিজয় ও চিত্ত আয়ত্ত করিলেন, পাপেচ্ছার মূলোৎ-পাটন হইল, মনের একাগ্রতা সাধিত হইল। ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের জন্য মনের যে অবস্থার প্রয়ো-জন, তাহা তিনি তখন প্রাপ্ত হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সোপানে আরোহণের উপযুক্ত হইলেন। তিনি জানিতেন যে চিত্তসংযম ব্যতিরেকে পরম-পুরুষার্থের সাধনা হয় না। এই জন্যই ভিক্ষুনামক উদাসীনসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, এবং দান, ধ্যান, শীল, তিতিক্ষা, বীর্য্য, প্রজ্ঞা এই কয়েকটী বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই প্রথম ও দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম করা জীবের পক্ষে বিশেষ কষ্ট-কর, এবং একরূপ অসাধ্য। এই সোপান দুইটী উত্তীর্ণ না হইলে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ সমুদায় ধারণা-সাধ্য হয় না। এই কারণেই তিনি মনুষ্যকুলকে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি করাইবার জন্য যত্ন-

শীল হইয়াছিলেন, এবং তদুদ্দেশ্যে শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই কারণেই তিনি চিত্ত-সংযম জন্য নিজে জীবের অসাধ্য তপস্যায় সমারূঢ় হইয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা মনুষ্যকুলকে ইহার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং সোপানদ্বয় উত্তীর্ণ হইবার ক্রমোন্নত উপায়-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে ধর্ম্ম-প্রচারক অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অত্যুচ্চ ধর্ম্মভাব শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন, তিনি মনুষ্য-স্বভাব আদৌ বুঝেন না। বুদ্ধদেব জানিতেন যে মনুষ্য যদি বুঝিতে পারে যে, সংসার যন্ত্রণাময়, স্নেহ-মমতা এই যন্ত্রণার মূল, তজ্জন্য স্নেহ-মমতার ধ্বংস করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে মনুষ্য চিত্ত-সংযম করিতে সমর্থ হইবে, এবং তখন নিষ্কলঙ্ক দর্পণে যেমন সকল মূর্ত্তিই প্রতিভাত হয়, তেমনি তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ সকল আপনিই উদিত হইবে। এতজ্জন্যই তাঁহার উপদেশে ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত হয় নাই। এখন বলুন দেখি, ঈশ্বরজ্ঞান-লাভের জন্য সংসারের অনিত্যতা-জ্ঞান ও চিত্তবৃত্তি-নিরোধ নিতান্ত আবশ্যক কি না ?

৩। পরমাত্মাকে নিত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞান।—

ইত্যগ্রে উল্লেখ করিয়াছি যে, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন; নিলীন হওয়াকে নির্ব্বাণ বলিতেন। তিনি সংসারকে অনিত্য পদার্থ জ্ঞান করিতেন, এবং সংসার হইতে বিচ্যুতির প্রার্থনা করিতেন। তবে কোন্ বস্তু তাঁহার এরূপ প্রিয় ছিল যে, তাহাতে তিনি নিলীন হইবার লালসা করিতেন? নিধন ত কোনও অস্তিত্ব নহে; অস্তিত্বের বিরহই নিধন। নিধনত্ব কিরূপে কামনার বিষয় হইবে? বুদ্ধদেব কি এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি এই ভাব-বিরহকে পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন? এপ্রকার বাক্য ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি অবশ্যই বিশ্বাস করিতেন যে, সংসার ও জীবাত্মা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠতর পদার্থ আছে, তাহা নিত্য ও পরিপূর্ণ; তজ্জন্য বলিতেন যে, তাহাতে লীন হইতে পারিলে জীবের মুক্তি হয়। পরমাত্মাকে তিনি অবশ্যই নিত্য ও পরিপূর্ণ বলিয়া জানিতেন। এপ্রকার জ্ঞান না থাকিলে ঈশ্বরে নিলীন হইবার ইচ্ছার উদয় হইবে কেন? যে পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই, যাহাকে পরম পদার্থ বলিয়া জ্ঞান নাই, তাহা লাভের ইচ্ছা, তাহাতে নিলীন হইবার লালসা, মানসিক নিয়মানু-

সারে অসম্ভব। বুদ্ধদেব সাংসারিক সুখের অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; সুখ ও দুঃখ, অনুরাগ ও বিরাগ, স্তুতি ও নিন্দার অতীত হইয়াছিলেন; নিত্য ও অনিত্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সুদুর্লভ পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন যে, নিত্য বস্তু একমাত্র, আর সকলই অসার। এইপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়াতেই তাঁহার সুখের নির্ব্বাণ, দুঃখের নির্ব্বাণ, ইন্দ্রিয়ের নির্ব্বাণ হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়-দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার প্রজ্ঞা-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এবং তিনি চতুর্থ-সোপানারোহণের উপযুক্ত হইয়াছিলেন।

৪। ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ততা।—নির্ব্বাণ শব্দে এ ভাবটীও নিহিত আছে। উন্মত্ততা ব্যতিরেকে কখনও স্বীয় অস্তিত্ব-জ্ঞান-লোপের ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। সুতরাং বিলীন হইবার কামনাও কেহ করে না। কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধদেব পরমজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ছিল না। এ বাক্যটী নিতান্ত ভ্রমমূলক। বুদ্ধের একটী বাক্য শুনুন—“প্রেম অপরিমিতরূপে, অপক্ষপাতে, অবিমিশ্রভাবে, শত্রুতাশূন্য হইয়া সমস্ত জগতে, জগতের

ঊর্দ্ধে, নিম্নে ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হউক।" জীবের প্রতি যাঁহার এত গাঢ় প্রেম, নিত্য পদার্থের প্রতি তাঁহার প্রেম ছিল না, এ কি যুক্তিসঙ্গত কথা? যাহার মন মতবিশেষে অন্ধ, সে ভিন্ন অপর ব্যক্তি বিনা তর্কে অনায়াসেই বুঝিবে যে, বুদ্ধদেব প্রেমের সাগর ছিলেন।

৫। স্বীয় অস্তিত্ব-জ্ঞানের লোপ।—স্বাস্তিত্ব-জ্ঞানের লোপ সহজসাধ্য নহে। এই মহাভাব বহু তপস্যার ফল। বহু আলোচনার পর জীবাত্মার ক্ষুদ্রতা, অসম্পূর্ণতা ও অনিত্যতা বুদ্ধদেব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন 'আমি' নাই, এক-মাত্র পরব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন। যখন পরমজ্ঞানের উদয় হইল, তখন তিনি আপনা-হারা হইলেন, আপ-নার পৃথক্ অস্তিত্ব ভুলিয়া গেলেন, একমাত্র নিত্য পদার্থে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার মনের সকল ভাবই তিরোহিত হইল, তিনি ঈশ্বরপ্রেমাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন, নির্ব্বাণই 'অমৃতম্ পদম্' (অনশ্বর পদ)। যিনি নিত্য, তিনিই একমাত্র পরম পদার্থ, তিনি স্বতন্ত্র-স্বরূপ, তিনি অনাদি, অনন্ত ও সম্পূর্ণ। তিনি সর্ব্বগুণের আধার, এবং

কলঙ্ক ও অভাব বিরহিত। অন্য সকলই অনিত্য, নিত্য পদার্থের ইচ্ছায় তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলেই ঐ সকলের লয় হইবে। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার নিবৃত্তিও আছে। যাহার আদি আছে, তাহার অন্তও আছে। যেমন মহাসমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘের উৎপত্তি হয়, পরে তাহা বারিরূপে পরিণত হইয়া নদনদ্যাদি আকারে অবশেষে সেই মহাসমুদ্রেই মিলিত হয়, তদ্রূপ এই স্রষ্ট জগৎ, যাহা সেই অনন্ত মহাসাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরিণামে তাহাতে যে নিলীন হইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? এপ্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে কাহার না অভিলাষ জন্মে? অমৃত-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিলে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার পার্থক্য কে না ভুলিয়া যায়? তাঁহাতে তদ্গতচিত্ত হইয়া কে না বলে যে, নির্ব্বাণই জীবাত্মার পরা গতি?

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, আত্মার অস্তিত্ব-ধ্বংসকে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ বলেন নাই। যে অর্থে বেদান্ত-শাস্ত্র পর-

মাত্মাতে জীবাত্মার লীন হওয়াকে নির্ব্বাণ বলে, সে অর্থেও তিনি নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার কথিত নির্ব্বাণ আধ্যাত্মিক নির্ব্বাণ। হৃদয় আমাকে বলিয়া দিতেছে যে, ঈশ্বরকে একমাত্র নিত্য পদার্থ ও জীবের পরা গতি, এবং জীবাত্মাকে অনিত্য ও নশ্বর জ্ঞানে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ এবং ঈশ্বর-প্রেমে বিহ্বলতা ও তজ্জনিত স্বাস্তিত্ব-জ্ঞানের বিচ্যুতিকে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-মুক্তি মনে করিতেন। আত্মার বিনাশ-সাধন-জন্য তিনি মনুষ্যকে সুখৈশ্বর্য্য ত্যাগপূর্ব্বক কঠোর ব্রতাবলম্বন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন নাই। তিনি জানিতেন যে, ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, স্বীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া, ঈশ্বরে লীন না হইলে অমরত্ব-লাভের উপায়ান্তর নাই। নিজের অস্তিত্বের বিচ্যুতি তাহার প্রার্থনীয় ছিল না; কেবল-মাত্র স্বীয় অস্তিত্ব-জ্ঞানের বিচ্যুতি তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অস্তিত্ব-জ্ঞানের বিচ্যুতি হইলেই অস্তিত্বের বিচ্যুতি হয় না। সুষুপ্তি অবস্থাকে ত কেহ আত্মার বিধ্বংস বলিয়া মনে করে না। দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলিবেন যে, অস্তিত্ব-জ্ঞানের বিচ্যুতি ও অস্তিত্বের বিচ্যুতি একই কথা, কেননা যে অস্তিত্বের

জ্ঞান নাই, তাহা অনস্তিত্বের তুল্য। কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিক বা প্রাকৃতিক বিচ্যুতির কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি আধ্যাত্মিক বিচ্যুতির কথা। ইহা জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিচ্যুতি নহে, পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা যে পৃথক্, এবম্প্রকার জ্ঞানের বিচ্যুতি মাত্র। বাক্যের দ্বারা এ ভাবটী সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। একবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করুন যে, "আমি সেই অমৃত প্রেম-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তদ্‌রসাস্বাদন করিতেছি"; উন্মত্ত হইবেন, আত্মবিস্মৃত হইবেন ও তখন বুঝিতে পারিবেন আধ্যাত্মিক নির্ব্বাণের প্রকৃত মর্ম্ম কি? তখন বুঝিবেন, যে 'আত্মজ্ঞানের বিচ্যুতি' ও 'আত্মার নিধন' একার্থ-প্রতিপাদক বাক্য নহে। বৌদ্ধ-গ্রন্থেও নির্ব্বাণ-লাভের চারিটী পদ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; যথা—পূর্ণ শ্রদ্ধা, পূর্ণ চিন্তা, পূর্ণ বাক্য ও পূর্ণ ক্রিয়া। এই কয়টী পথ অবলম্বন করিলে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ও আত্মসংযমের অধিকার জন্মে। বুদ্ধদেব বুঝিয়াছিলেন, এইরূপ জ্ঞানের উদয় এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে জীবের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে; অন্যান্য সোপানে আরোহণের উপায় তাহাকে আর বলিয়া

দিতে হইবে না, ঈশ্বরানুকম্পায় সে তখন সকলই বুঝিতে পারিবে। এই জন্যই তিনি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রোতাদিগের মন বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, জ্ঞানই বিশ্বাসের মূলাধার। জ্ঞান-বিহীন বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস। তাহা চিরস্থায়ী নহে; তাহা কালে ভ্রমপুঞ্জে পরিবেষ্টিত হইয়া মনুষ্য-মন অজ্ঞান-তামসাচ্ছন্ন করে। প্রকৃত জ্ঞানী ভিন্ন অন্যে নির্ব্বাণ-ভাবের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, নির্ব্বাণ-লাভের অধিকারী হয় না। জ্ঞান বিস্তার করা মনুষ্যের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মপ্রচারকের প্রথম কর্ত্তব্য। এই জন্যই বুদ্ধদেব জ্ঞান-লাভের উপায় বিশদভাবে বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়স্থিত মহদ্ভাবনিকর যদি তিনি সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে কেহ কি তাহার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইত? না তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিত? কর্ষিত ও উপযুক্ত ভূমি ভিন্ন কোন্ কৃষক জঙ্গলাবৃত কঠিন মৃত্তিকায় বীজ বপন করে? এবং কেই বা তদ্রূপ কার্য্যে ফল লাভ করে?

নির্ব্বাণ ও মধুর প্রেম।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চৈতন্যদেবের মধুর প্রেমে এবং বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণে পার্থক্য নাই। দুই ভাবে দৃষ্টতঃ পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। একটী ভাব প্রেমাধিক্য, দ্বিতীয় ভাবটী জ্ঞানাধিক্য পরিচায়ক। চৈতন্য-প্রভুর জন্মের বহু পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তজ্জন্য তিনি জ্ঞানপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। চৈতন্যদেব যখন অবতীর্ণ হন, তৎকালে 'জ্ঞান'-সম্বন্ধে উপদেশ দিবার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তিনি দেখিলেন, প্রেমের ভিত্তি-ভূমি গ্রথিত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি প্রেম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞান ও প্রেম নির্ব্বাণ-সাধনার দুইটী অঙ্গ। জ্ঞান হইতেছে আদি, প্রেম হইতেছে অন্ত অঙ্গ। চৈতন্যের মতে "প্রেম সর্ব্ব-সাধ্য-সার।" আবার কান্ত-ভাব "প্রেম-সাধ্য-সার।" কান্ত-ভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য-জ্ঞান তিরোহিত হয়, এবং উভয়ের একত্ব-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এ প্রেমে আত্মজ্ঞান নাই, আত্মসুখেচ্ছা নাই; ইহা নিঃস্বার্থ প্রেম।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম॥"

এই কারণেই আমি বলিয়াছি যে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণে ও চৈতন্য প্রভুর মধুর প্রেমে কোনও পার্থক্য নাই। আপনি পরম বৈষ্ণব, চৈতন্য-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আপনাকে অধিক কি বলিব, আর আমি জানিই বা কি?

কৈবল্য-পদ।

নির্ব্বাণ-বিষয়ের আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটী কথার উল্লেখ করিব। আমি ইতি-পূর্ব্বে পাতঞ্জল দর্শনের উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত-দর্শন-প্রবর্ত্তকের মতে 'কৈবল্য-পদ'-লাভই জীবের মোক্ষফল। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যে, যোগিগণ সমাধি-বলে 'অনাশয়' অর্থাৎ কর্ম্ম-বাসনা-বিরহিতা-বস্থা প্রাপ্ত হন। সাধারণের চিত্ত হইতে তাঁহাদের চিত্ত বিলক্ষণ অর্থাৎ ক্লেশাদি-পরিশূন্য। তাঁহাদিগের কোনপ্রকার কর্ম্মফলের অভিলাষ নাই। যোগদ্বারা বাসনা নির্ম্মূল হইলে প্রতিক্ষণেই চিত্তের নশ্বরত্ব উপলব্ধি হয়, সুতরাং চিত্তগত বাসনাও অনিত্যরূপে

প্রতীত হয়। যিনি পুরুষ চৈতন্য, তিনিই চিত্তের প্রভু; তিনি চিন্ময়; তাঁহার কোনরূপ পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর হয় না। কিন্তু চিত্ত দৃশ্য ও জড় পদার্থ, স্বয়ং প্রকাশক নহে। বুদ্ধির স্বাভাবিক জ্ঞান নাই, কেবল আত্মার সহযোগে এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে; যেহেতু আত্মা স্বপ্রকাশক ও পরপ্রকাশক, অর্থাৎ তিনি আপনি প্রকাশ পায়েন ও অপরকেও প্রকাশ করিতে পারেন। তজ্জন্য আত্মার সহযোগে বুদ্ধিদ্বারা চিত্তের বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আত্মা ভিন্ন মন, বুদ্ধি, সকলই জড় পদার্থ। যে সময়ে চিত্ত অন্য বিষয় অনাসক্ত হইয়া কেবল সেই চিন্ময় পুরুষে অবস্থিতিপূর্ব্বক সেই চিন্ময় আত্মার চিৎ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখনই চিত্ত আপনি আপনাকে জানিতে পারে, এবং সকলপ্রকার সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণ করিতে ও সর্ব্ব কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয় এবং মোক্ষ-প্রাপ্তির পথে গমন করিতে থাকে। ভোগ-সাধন ও মোক্ষ-সাধনই পুরুষের প্রয়োজন। যখন সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ ও তমোগুণের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই প্রকৃতি পুরুষের ভোগ সাধন করে; আর যখন রজোগুণ ও তমোগুণকে

অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশ পায়, তখনই ঐ প্রকৃতি আত্মার মোক্ষ সাধন করে। চিত্ত পুরুষের সহিত মিলিত হইলেই ঐ সকল কার্য্য করিতে পারে। যে সময়ে চিত্ত আপনার ও পুরুষের বিশেষ দর্শন করে, তখন কর্ত্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া আত্মার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়। "আমি কর্ত্তা, আমি জ্ঞাতা, ও আমি ভোক্তা" ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইলে, আর তাহার কোন কর্ম্মের চেষ্টা থাকে না। চিত্ত আপনার স্বরূপ জানিতে পারিলেই আত্মাকার প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্য-পদ লাভ করে। তখন কেবল চিন্ময় আত্মামাত্র অবশিষ্ট থাকে। কৈবল্যের সাধারণ স্বরূপ এই, "গুণ সকল ভোগ ও অপবর্গ-লক্ষণ পুরুষার্থ-শূন্য হইলে প্রকৃতির পরিণামিত্ব রহিত হয় (অর্থাৎ প্রকৃতি স্বকারণে লয় প্রাপ্ত হয়), ক্ষণকালের নিমিত্তও কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না ; অথবা চিৎ-শক্তির স্বরূপের লয় হইয়া আত্মার চিৎস্বরূপে যে অবস্থিতি হয়, তাহার নাম কৈবল্য।" মনোযোগ দিয়া এই কথাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পতঞ্জলির কৈবল্য-পদেও নির্ব্বাণ-ভাব নিহিত আছে। কৈবল্য-পদ নীরস, মধুর-ভাব-বিরহিত ও নির্ব্বাণের অনুবর্ত্তী মাত্র।

উপনিষদের মধ্যেও জীবাত্মা ও পরব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক অনেকগুলি মহাবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা পাঠ করিলেও মনে হয় যে, উপনিষৎ-কারগণ নির্ব্বাণভাব কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', আমি ব্রহ্ম; 'তত্ত্বমসি', তুমি ব্রহ্ম; 'অহমাত্মা ব্রহ্ম', এই জীবাত্মা ব্রহ্ম, ইত্যাদি বাক্য 'নির্ব্বাণ'-ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা নির্ব্বাণের বৈজ্ঞানিক অঙ্গমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা নির্ব্বাণের আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবের ন্যায় স্বাস্তিত্ব ভুলিয়া যান; চৈতন্য-প্রভুর ন্যায় 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি'-কামনায় বিহ্বল হন; 'আমি', 'তুমি' ও 'জীবাত্মা' ইত্যাকার জ্ঞান তাঁহাদের হৃদয় হইতে তিরোহিত হয়; অদ্বৈতবাদের প্রকৃততা তাঁহারা স্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে আপনাকে একটী কথা বলিব। আপনি ভাবিবেন না যে, আমি 'অদ্বৈতবাদ' মতকে এককালীন ভ্রমাত্মক মনে করি। আমার মতে অদ্বৈত-বাদে সত্য ও ভ্রম উভয়ই বর্ত্তমান আছে। ইহা প্রকৃত মতের একপার্শ্বিক দৃষ্টি মাত্র। বৈজ্ঞানিক-

নেত্রে নির্ব্বাণ-মতের এক পার্শ্ব দৃষ্টি করায় অদ্বৈত-বাদের, ও অপর পার্শ্ব দৃষ্টি করায় মায়াবাদের, উৎপত্তি হইয়াছে। উভয় মত একত্র করিলে প্রকৃত মতের আভাস পাওয়া যায়। আমার পত্রখানি ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িতেছে, নীরসও হইতেছে, তজ্জন্য এ বিষয়ে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সময়ান্তরে সুযোগমতে আপনাকে বলিব। অদ্য এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম।

দার্জ্জিলিঙ্গ-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া দর্শনশাস্ত্রের কুটিল তর্কজালে জড়িত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। অপরিচিত পথে পরিভ্রমণ করিতেছি, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছি; সুবোধের ন্যায় কার্য্য করি নাই। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে এত দূরে উপনীত হইব, প্রথমে মনে করি নাই। দার্জ্জিলিঙ্গবাসীদিগের আচার-ব্যবহারের ও দার্জ্জিলিঙ্গস্থ নৈসর্গিক পদার্থের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আপনার যে কৌতূহল জন্মিয়াছে, আমার অল্প-দিনের অর্জ্জিত জ্ঞানে তাহার নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু মহৎ ব্যক্তিকে তুষ্ট করা অতি সহজ ব্যাপার। শ্রদ্ধা-সহকারে যাহা কিছু আপনার হস্তে

অর্পণ করিব, তাহাতেই আপনি সন্তুষ্ট হইবেন, তদ্-বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সাহসে এই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমময় বৃত্তান্ত আপনাকে উপহার দিতেছি।

কাঞ্চিনজিঙ্ঘা।

২২শে জুন শুক্রবার।—অদ্য প্রাতে আকাশ-মণ্ডলে মেঘের কণামাত্র উদয় হয় নাই। সুনীল নভঃস্থলে ভগবান্ মরীচিমালী সগর্ব্বে পরিভ্রমণ এবং তীক্ষ্ণ রশ্মি-রাশি বিকীর্ণ করত ধরাতলস্থ ধ্বান্ত নাশ করিতেছেন দেখিয়া আমি শয্যাত্যাগ করিলাম। উঠিবামাত্রই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন-গোচর হইল। দূরে তুষার-মণ্ডিত একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গ প্রদীপ্ত-রজত-রাশি-সদৃশ শোভা পাইতেছে। ভূগোলবেত্তৃগণ ইহাকে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' বলেন, কিন্তু ভুটিয়ারা বলে, ইহার নাম 'খাচেন ঝঙ্গা'; 'খাচেন' = মহাতুষার, ঝ = শৃঙ্গ, ঙ্গা = পঞ্চ, অর্থাৎ মহাতুষারমণ্ডিত পঞ্চ শৃঙ্গ। এই পর্ব্বত-শৃঙ্গ বা শৃঙ্গমালা দার্জ্জিলিঙ্গ নগর হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৪৫ মাইল দূরে। ইহার উচ্চতা ২৮১৭৮ ফিট্।

'এভারেষ্ট' বা গৌরী-শিখর শৃঙ্গ ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শৃঙ্গ পৃথিবীতে নাই। এই হিমাদ্রি-শিখর চিরতুষারমণ্ডিত। কাঞ্চিনজিঙ্ঘার ক্ষুদ্রতম শৃঙ্গের নাম চোলা পাস। দার্জ্জিলিঙ্গ নগর হইতে শিকিমান্ত-র্গত দমশং স্থান পর্য্যন্ত অনায়াসে যাওয়া যায়। তথা হইতে চোলা পাস পর্য্যন্ত পথ অতিশয় দুর্গম। কাঞ্চিনজিঙ্ঘাকে ভুটিয়াগণ দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে। ইনি মনুষ্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে ঝড়-বৃষ্টি প্রেরণ করিয়া গৃহ ও শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করেন। শাক্যমুনি ইহাঁর শিষ্য ছিলেন। ক্রমে রৌদ্রের তেজ বৃদ্ধি হইল। নগর-দর্শনে বহির্গত হইলাম। বিপণিমালা দেখিতে দেখিতে 'চৌরাস্তায়' উপনীত হইলাম। তথায় দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিয়া 'মল' (Mall) পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। মহাকাল পাহাড়ের নিম্নভাগ বেষ্টন করিলাম। 'মলের' এক স্থান হইতে 'কাঞ্চিনজিঙ্ঘা' দেখিতে পাইলাম। তখনও তাহার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় নাই। প্রাতঃ-কালে এই স্থান হইতে এই পর্ব্বতশৃঙ্গটী অতীব সুন্দর দেখায়। এখান হইতে লিবঙ্গের সমতল ভূমি এবং ভুটিয়াবস্তিও দেখিতে পাইলাম। অনেক সাহেব

ও মেম এই রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। একে ত এখানে তাঁহাদের অভাব নাই, তাহাতে আবার ছোট লাট বাহাদুরের শৈল-বিহারের সময়; দলে দলে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গীগণ কিল বিল করিতেছেন।

শ্রবরি রাজভবন।

মল হইতে শ্রবরি দেখিতে গেলাম। পাহাড়িয়া-গণ ইহাকে 'বারধুড়িয়া' বলে। ইহা বঙ্গপ্রদেশাধি-পতির শীতাবাস। রাজভবন অতি বৃহৎ ও পরম সুন্দর। ভোগবিলাসী ব্যক্তির বাঞ্ছনীয় সকলপ্রকার সামগ্রীই এখানে বর্ত্তমান। মনোহর উদ্যান, ক্রিকেট খেলিবার স্থান, বল্‌গৃহ, পার্ক প্রভৃতি ইংরেজ-মনোরঞ্জনকারী সকল সামগ্রীই শোভা পাইতেছে। লাট সাহেব মন্ত্রিদল-বল-সহ এখানে অবস্থিতি করিতে-ছেন, তজ্জন্য রাজভবনটী ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। দূর হইতে যাহা দেখিলাম, তাহাতেই প্রতীতি হইল যে, বঙ্গবাসিগণ অকৃতজ্ঞ নহে। রাজ্য-শাসন-চিন্তায় কি জানি ছোট প্রভুর মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মায়, এই আশঙ্কায় দেশীয় গরীব কৃষক পর্য্যন্ত

উদরান্নের হানি করিয়া, ক্ষুধার্ত্ত পুত্র-কন্যার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করত নিরন্তর তাঁহার ভোগবিলাসের আয়োজন করিতেছে।

অক্‌ল্যাণ্ড রোড।

পরে অক্‌ল্যাণ্ড পথাভিমুখে গমন করিলাম। জলা পাহাড় শৃঙ্গের একটী বাহুর উপর এই পথটী। এই রাস্তার সন্নিকটে অনেকগুলি সুন্দর ভবন আছে। কুচবিহারের মহারাজের একই আকারের কয়েকটী কুঠী দেখিতে পরম সুন্দর। মহারাজ বাহাদুর বিলাত-তীর্থ-দর্শন-মানসে গমন করিয়াছেন। মহারাণী একটী বাড়ীতে পুত্র-কন্যা সহ বাস করিতেছেন। সে দিবস জলা পাহাড় হইতে নামিবার সময়ে মহারাণীর দর্শন লাভ করিয়াছিলাম, তখন তিনি শিঞ্চল-শৃঙ্গে গমন করিতেছিলেন। একে অস্ত্রধারী সৈনিকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহাতে আবার গিন্নি সঙ্গে ছিলেন, কাজেই মহারাণীকে পূর্ণনেত্রে দেখিতে সাহসী হই নাই, তজ্জন্য তাঁহার রূপ-বর্ণনা করিতে অশক্ত হইলাম। তবে

এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি 'রাজরাণী,' কমলার বিশেষ অনুগ্রহপাত্রী, অবশ্যই পরম রূপবতী হইবেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম যে, দুইটী ঝরণা মিলিত হইয়া প্রবল-বেগে নিপতিত হইতেছে। এই নির্ঝরটীই নিম্নে গিয়া বৃহদাকার জলপ্রপাতে পরিণত হইয়া 'ভিক্টোরিয়া ফল' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এ স্থানটী অতীব সুন্দর। দুই দিকে দুইটী পর্ব্বতবাহু ও তন্মধ্যে বিগলিত রৌপ্যসদৃশ নির্ঝরবারি, এবং নিম্নে পর্ব্বতপৃষ্ঠে স্তরে স্তরে সুন্দর সুগঠিত সৌধমালা নয়নের সার্থকতা সাধন করিল। অনেক ক্ষণ এই স্থানের শোভা দেখিলাম। সঙ্গে ছোট কন্যাটী ছিল, বনপুষ্প চয়ন ও গিরিকুন্তল উত্তোলন করিয়া তাহাকে বনদেবী সাজাইলাম, নিজের কোটের নানা স্থানে পুষ্পাদি সন্নিবেশিত করিলাম ও গিন্নির মস্তকাবরণের শোভা বাড়াইয়া দিলাম। হৃদয়ে নানাবিধ ভাবের উদয় হইল, কিন্তু ভাবগুলি আয়ত্তাধীন করিবার জন্য যথেষ্ট সময় প্রাপ্ত হইলাম না। জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, ভাবসংগ্রহ কার্য্যটী স্থগিত রাখিয়া ভবনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। দাণ্ডি-যোগে 'স্থূল শরীর' বাসায়

উত্তীর্ণ হইবার বহুপূর্ব্বেই 'লিঙ্গ শরীর' তথায় গমন করত মিষ্টান্নাধারে প্রবেশ করিয়াছিল।

আহারান্তে পুনরায় ভ্রমণার্থ যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত না হইতেই ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ২৭শে জুন পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টি পড়িল। একে একে বাসার সকলেরই পেটের পীড়া হইল। বর্ষার সময়ে এখানে পেটের পীড়ার বড় প্রাদুর্ভাব। যাহারা জল উষ্ণ না করিয়া পান করে, কি গাত্রাবরণ মুক্ত করিয়া থাকে, তাহারা এই রোগাক্রান্ত হয়। বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম। দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য মন ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিছু দিন পূর্ব্বে যে জলদ-সঞ্চয়ে ঈশ্বরের অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়াছিলাম, সেই মেঘসঞ্চার মাধুর্য্য-বিহীন হইল; যে বিদ্যুদালোকে ঈশ্বরের বিমল জ্যোতি অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভীষণাকার ধারণ করিল; কুজ্‌ঝটিকা বিরক্তিজনক, বারিবর্ষণ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। আমার বাহ্যিক কোন পীড়া লক্ষিত হয় নাই, কিন্তু আভ্যন্তরিক পীড়া যে জন্মিয়াছিল, তাহা ত এই পত্রদ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে।

দার্জ্জিলিঙ্গের অধিবাসী।

নেপালী, ভুটিয়া, লেপ্‌চা, কোচ, মেচ এবং টিমাল এই কয়েক জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী। ইহাদের সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। নেপালী।

নেপালীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক বর্ণের লোক আছে। গুরুং, কামি, মুর্ম্মি, খাম্বু, লিম্বু, মঙ্গার ও নেওয়ার তন্মধ্যে প্রধান। নেপালীগণ কৃষিকার্য্যে ও চা-ক্ষেত্রের কার্য্যে বিশেষরূপে দক্ষ। ইহারা পরিশ্রমী, সাহসী ও বলিষ্ঠকায়। নেপালী ব্রাহ্মণদের উপনয়ন, চূড়াকরণ এবং বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ বৈদিকমতে সম্পাদিত হয়। বিবাহে পৌরোহিত্য-ক্রিয়া প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বারাঙ্গনা-প্রথার প্রতি বড় কঠিন শাসন। এমন কি ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও তাহার উপপতির প্রাণ-সংহার করিলেও স্বামী দণ্ডনীয় হয়

না। কন্যা পূর্ণবয়স্কা না হইলে প্রায় বিবাহ হয় না। বাল্য-বিবাহ বিরল, কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে এবং বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে।

(ক) গুরুং ও মঙ্গার।—গুরুং জাতি যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। মঙ্গারগণও সাহসী যোদ্ধা। নেপালে ইহারা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, বৌদ্ধের সংখ্যাও কম নহে। মঙ্গার নেপালীগণ সত্যনারায়ণ দেবকে বিশেষরূপে ভক্তি করে, এবং প্রায়ই তাঁহাকে সির্ণি দিয়া উপাসনা করে। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী গুরুংদের একজন প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহারা এখন পর্য্যন্ত পর্ব্বত ও নদ্যাদির পূজা করে; শব দাহ করে না; এবং গোমাংস কি শূকরমাংস ভক্ষণ করে না।

(খ) মুর্ম্মি।—মুর্ম্মিগণ নেপালের আদিম অধিবাসী। ইহারা কৃষি-ব্যবসায়-জীবী। ইহারা যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা স্থির করা সহজ নহে। মিশ্রিত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বোধ হয় ইহাদের ধর্ম্ম। বিবাহের সময় লামাগণ পুরোহিতের কার্য্য করেন। ইহারাও কুন্তীতনয় ভীমসেনকে দেবতা বলিয়া উপাসনা করে।

(গ) কামি।—কামিগণ প্রায়ই লৌহকার। ইহারা বলে যে, বিশ্বকর্ম্মা ইহাদের আদি পুরুষ। ইহাদের বিবাহ-পদ্ধতি হিন্দুদিগের ন্যায়। স্বামী যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন। পাঙ্গরো-নামক একপ্রকার ফল আছে, স্বামী সেইটী এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা দ্বিখণ্ড করিলেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে স্ত্রীও বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে পারে। কামিদের ব্রাহ্মণ নাই; যাহাকে ধার্ম্মিক মনে করে, সেই পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করে। ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। কালী ও বিশ্বকর্ম্মা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। সুবিধা অনুসারে ইহারা শব দাহ করে অথবা নদীর জলে নিক্ষেপ করে; কখন কখন পুতিয়াও ফেলে। কেহ কেহ শবভস্ম পবিত্রসলিলা ভাগীরথীতে নিক্ষেপ করে। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু শূকরমাংস-ভক্ষণ ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।

(ঘ) থাম্বু।—থাম্বুরাও যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। ইহাদের বিশ্বাস যে, ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ পারুবঙ্গ কাশীধামে বাস করিতেন। পারুবঙ্গকে ইহারা গৃহ-দেবতা বলিয়া

অর্চ্চনা করে। ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী; পার্ব্বতীর উপাসনা করে। ইহাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তার মত জানিবার জন্য বর-কর্ত্তা, দুই চোঙ্গা মাড়যো মদ এবং এক খণ্ড শূকর-মাংস সহ একটী লোক কন্যাকর্ত্তার নিকট পাঠাইয়া দেন। উভয়ের মত হইলে প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। ব্যভিচার-দোষ ঘটিলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে।

(ঙ) লিম্বু।—লিম্বুরা অনেক গোষ্ঠী। কতক কাশী হইতে ও কতক তিব্বত হইতে আসিয়া প্রথমতঃ নেপালে বাস করে। যাহারা তিব্বত হইতে আইসে, তাহাদের লাসা গোত্র। যাহারা কাশী হইতে আগমন করিয়াছে, তাহাদের কাশী গোত্র। লিম্বুরা সাহসী, বলিষ্ঠকায় এবং যোদ্ধা। কৃষি ও পশ্বাদি-পালন ইহাদের প্রধান জীবনোপায়। ইহাদের অধিকাংশ হিন্দু; অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ। মহাদেব ও গৌরী ইহাদের প্রধান দেবতা। ব্রাহ্মণে ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহারা আহারাদির কিছুমাত্র বিচার করে না; গোমাংস প্রভৃতিও ভক্ষণ করে।

(চ) নেওয়ার।—নেওয়ারগণ সর্ব্বোচ্চ জাতি। ইহারা কৃষি ও স্থপতির কার্য্যে বিশেষ পটু। ইহাদের অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ। আচার ও ব্যবহার গুরুংদের আচার-ব্যবহারের ন্যায়।

২। ভুটিয়া।

তিন শ্রেণীর ভুটিয়া আছে; শিকিম ভুটিয়া, সার্পা ভুটিয়া ও তিব্বতীয় ভুটিয়া। ভুটিয়ারা প্রায়ই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু বুদ্ধের বিমল ধর্ম্ম অজ্ঞান ও অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া নানারূপ কুসংস্কারে জড়িত হইয়াছে। ইহাদের মন্ত্রগুরুর নাম লামা। একটী লামা দেখিয়াছিলাম। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে 'কড়কা' (মাণিচক্র) সর্ব্বদা ঘুরিতেছিল, এবং তিনি "ওম্ মাণি পদ্‌মে হুম্" মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। ভুটিয়াগণ কুৎসিত উপদেবতার ও ভূত-প্রেতাদির পূজা করে, এবং অতি কদর্য্য স্থানে বাস করে। ইহাদের গাত্রবস্ত্র নিতান্ত অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধময়। ইহারা স্বভাবতঃ উগ্র, অত্যন্ত মাংসাশী ও মদিরা-প্রিয়। ইংরেজ মহোদয়গণের অনুগ্রহে ভুটিয়াগণ এক্ষণে

সভ্যতা-সোপানে পদার্পণ করিতেছে; পরিচ্ছদের পারিপাট্যের দিকে ইহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং অনেক ভুটিয়া স্ত্রীলোক গাউন ও কেহ কেহ বঙ্গদেশীয় শাড়ী পরিধান করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ভুটিয়া বালকদিগের শিক্ষার্থ কয়েকটী বিদ্যালয়ও এখানে স্থাপিত হইয়াছে। ভুটিয়াদের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রী-সতীত্ব অতি বিরল; এক স্ত্রী বহু স্বামী গ্রহণ করিলে দোষ হয় না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সময়ানুসারে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের আহার ও ব্যবহার অতি কদর্য্য। ইহারা সকলপ্রকার মাংস ভোজন করে। সার্পা ভুটিয়াগণ নিতান্ত অসভ্য, দেখিতে ভয়ঙ্কর ও একগুঁয়ে।

৩। লেপ্‌চা।

লেপ্‌চাগণ দুই ভাগে বিভক্ত; রঙ্গ ও খাম্বা। রঙ্গগণ শিকিমের আদিম নিবাসী। খাম্বাগণ চীনদেশ হইতে আসিয়া এ স্থানে বাস করিয়াছে। ইহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা ভুটিয়াদের আচার-ব্যবহা-

য়ের ন্যায়। ইহারা অপেক্ষাকৃত ধীর ও শান্ত এবং দেখিতে বড় সুন্দর। ইহাদের কেশপাশ সচরাচর আগুল্‌ফলম্বিত; স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বেণী-বন্ধন করে ও পুরুষগণ প্রায়ই শ্মশ্রুবিহীন, তজ্জন্য অনেক সময়ে স্ত্রী পুরুষ ভেদ করা সুকঠিন। লেপ্‌চাদের বেশবিন্যাস মন্দ নহে; কিন্তু আহারাদি বড়ই কদর্য্য, সকল প্রকার মাংসই আহার করে। গোমাংস ও শূকরমাংস উপাদেয় মনে করে। হস্তী, গণ্ডার, বানর প্রভৃতির মাংসও আহার করে। প্রায় সকল সময়েই মদ্য পান করে। ইহাদের বিবাহ কার্য্য সামান্যেই সম্পন্ন হয়। কথা-বার্ত্তা স্থির হইলে বরকর্ত্তা দশ সের মাড়যো মদ, একখানি রেশমী রুমাল ও ৫৲ টাকা কন্যাকর্ত্তাকে দান করেন। বিবাহের সময় বর ও কন্যা একখানি গালিচার উপর উপবিষ্ট হয়, এক জন লামা উভয়ের গলায় রুমাল বান্ধিয়া দেন, পরে রুমাল পরিবর্ত্তন করা হয় ও দম্পতীর মস্তকোপরি তণ্ডুল ছড়ান হয়, এবং তাঁহারা এক পাত্রে মাড়যো পান করেন। পরে আহারাদি করিয়া সকলে চলিয়া যায়। ইচ্ছানুসারে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার

মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে। বিধবা-বিবাহ অন্য আকারেও হইতে পারে। এক স্ত্রী বহু স্বামী গ্রহণ করিলে দোষ হয় না। সাধারণতঃ রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব প্রথা অনুসারে ইহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। লেপ্চারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু ভূত, প্রেত ও বৃক্ষ-লতাদিরও পূজা করিয়া থাকে। লেপ্চারা মহাদেব এবং তাঁহার স্ত্রী উমাদেবীরও উপাসনা করে। ইহারা লামাগিরি প্রাপ্ত হয় না; ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সন্ন্যাসী হন, তাঁহাদিগকে 'বিজুয়া' বা 'ওঝা' বলে।

৪। কোচ।

কোচগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; কোচ মণ্ডাই, রাজবংশী বা শিববংশীয় এবং পলিয়া। ইহারা ভঙ্গ-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয় এবং রাজা দশরথকে আদি পুরুষ বলে। শিববংশীয় কোচদের কথা ইতি-পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কোচেরা আচার-ব্যবহারে না হিন্দু, না মুসলমান। গোমাংস ব্যতীত প্রায় সকল প্রকার মাংসই ইহারা আহার করে; মদ্যপান দূষণীয়

মনে করে না। ইহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে। দার্জ্জিলিঙ্গ-নিবাসী কোচদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু এ বিবাহে কোনরূপ ক্রিয়াদি নাই। আপন আপন ইচ্ছানুসারে স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহিত হয়। এই জেলার কোচগণ কালীর উপাসক; মনসা, হনূমান্ প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া মান্য করে।

৫। মেচ ও ঢিমাল।

এই দুই জাতির আচার-ব্যবহার একই প্রকার। ইহাদের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, দেবতাগণ ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্বর্গ হইতে নিক্ষেপ করেন ও তাঁহারা তিন ভ্রাতায় কাশীধামে পতিত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইতে মেচ, কোচ ও ঢিমাল জাতির উৎপত্তি। অপর দুই ভ্রাতা লিম্বু ও খাম্বুদের পূর্ব্ব-পুরুষ। ঢিমালদের বিবাহে 'সাত পাক' হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বাল্য-বিবাহ বিরল। মেচগণ শৈবধর্ম্মাবলম্বী। ঢিমাল-গণ কতক শৈব ও কতক বৈষ্ণব। তরাই প্রদেশে

অনেক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; প্রত্যেকটীতেই প্রায় তিনটী করিয়া দেবমূর্ত্তি আছে। মধ্যে কৃষ্ণমূর্ত্তি, তাহার এক পার্শ্বে চৈতন্যদেবের এবং অপর পার্শ্বে নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি। ইহারা সূর্য্য প্রভৃতি দেব দেবীর অর্চ্চনা করে; গোমাংস আহার করে না, কিন্তু শূকরমাংস ইহাদের অখাদ্য নহে। ইহারা বড় নম্র ও শান্ত-প্রকৃতি।

যে কয়েকটী জাতির উল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে নেপালী, ভুটিয়া ও লেপ্‌চার সংখ্যাই দার্জ্জিলিঙ্গ সহরে অধিক। কোচ, মেচ ও টিমালের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তাহারা নগণ্যের মধ্যে পড়িয়াছে।

পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদের অবগুণ্ঠন নাই। সচরাচর পরিচ্ছদ বিশেষ-লজ্জাসূচক নহে। নেপালী স্ত্রী-লোকেরা কাঁচুলী ব্যবহার করে। এদেশীয় স্ত্রীলোকদের অলঙ্কার দেখিতে কৌতুকাবহ। স্বর্ণালঙ্কার বিরল; অনেকে টাকা, আধুলি, শিকি, দুয়ানির কণ্ঠমালা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। লেপ্‌চাদের হস্তে বলয়

ও কর্ণে রৌপ্যকুণ্ডল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ভুটিয়া স্ত্রীলোকের গলায় কাচখণ্ড, চন্দ্ররুষ (মুঙ্গা) পলা ও কটিদেশে পিত্তল বা রৌপ্যের হার সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কণ্ঠে পরিবার 'সিড়ি' নামক এক-প্রকার রৌপ্য-মাল্য আছে, তাহা আমাদের দেশীয় পাঁইজোরের ন্যায় তারে বুনানি করা, অতিশয় চওড়া এবং নাভি পর্য্যন্ত লম্বা। কর্ণের কুণ্ডলকে ইহারা 'মুম' ও 'গদড়ি' বলে। দুর্গাদেবীর অসুরের গলায় যেপ্রকার মোটা মালা দেখিতে পান এবং যেরূপ মালা কখন কখন হিন্দুস্থানী দ্বারবানের গলায় দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ মালাও এখানকার কোন কোন স্ত্রীলোকের গলায় দেখিয়াছি; এই মালাকে ইহারা 'কণ্ঠা' বলে। নাকছাপিকে ইহারা 'ডুঙ্গড়ি' বলে। ডুঙ্গড়ি আমাদের নাকছাপি হইতে প্রায় চারি গুণ বড়। ইহারা তাগাকে 'জন্দর', চুড়িকে 'বাইন' এবং বালাকে 'চুড়ি' বলে। বাইন ও চুড়ি প্রায়ই রৌপ্য-নির্ম্মিত।

চা-ক্ষেত্র।

২৮শে জুন বৃহস্পতিবার—বেড়াইতে গিয়া চা-ক্ষেত্র বিশেষ করিয়া দেখিলাম। চা-ক্ষেত্র গুলি দেখিলে বোধ হয়, পর্ব্বত-গাত্রে কে যেন হরিদ্‌বর্ণের মনোহর গালিচা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। চা-আবাদ দ্বারা এ জেলার বিশেষ উপকার হইয়াছে; অনেক হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি রমণীয় চা-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পার্ব্বত্য বিভাগে যথেষ্ট চা জন্মিয়া থাকে। ১৮৫৩ সালে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক চা-আবাদের চেষ্টা হয়, এবং ১৮৫৬ সাল হইতে আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এখন অনেকগুলি চা-বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশবাসিগণও একত্র হইয়া চা-আবাদ করিতেছেন। চা-ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ আছে। কোন কোন চা-কোম্পানি শতকরা ৩০।৪০ টাকা পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ড দিতেছেন। দার্জ্জিলিঙ্গ জেলায় ১৮৪টী চা-ক্ষেত্র আছে এবং প্রায় ১৪ লক্ষ বিঘা জমিতে চা-আবাদ হয়। ১৮৯৩ সালে এই জেলায় ১,৩২,২৭০ মণ চা প্রস্তুত হইয়াছিল।

দার্জ্জিলিঙ্গবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

বৈকালে এখানকার কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকার সরকারী উকীল। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সুশিক্ষিত এবং এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইহাঁর মত ভদ্রলোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি, দেখি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহেন্দ্র বাবুর সহিত আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম।

পর দিবস মহেন্দ্র বাবুর বাসায় যাই। এখানে একটী 'হিন্দু পবলিক হল' নির্ম্মিত হইতেছে। মহেন্দ্র বাবু ইহার প্রধান উদ্যোগী। সাহেব মহোদয়গণের দুইটী 'পবলিক হল' আছে। একটী উচ্চশ্রেণীর, ও অপরটী মধ্যম শ্রেণীর সাহেবগণের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত। কোনটীতেই এদেশীয় লোকের প্রবেশাধিকার নাই। এ ব্যবস্থা অন্যায় নহে। জেতা ও জিত জাতির সম্বন্ধ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহাতে কোন দোষ লক্ষিত হয় না। বিধাতার নির্ব্বন্ধানুসারে আমরা জেতৃগণের পদতলে থাকিব, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের পাদুকা-সংলগ্ন লৌহ-শলাকার

আঘাত সহ্য করিব; তাঁহাদের সমস্থানীয় হইবার বাসনা করা আমাদের অতীব ধৃষ্টতা। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা কি লজ্জাকর নহে? কে কবে শুনিয়াছে যে, "পঙ্গু লঙ্ঘে তুঙ্গ শৃঙ্গ, মুলা ধরে অসি"? আমি অবিবেচক লোক নহি, সাহেবেরা আমাদিগকে তাঁহাদের স্থানে যাইতে দেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলাম না। মহেন্দ্র বাবুর পবলিক হলটী প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। ঘরটী মন্দ হইবে না। মহেন্দ্র বাবুর বাসা হইতে আমার বহুদিনের বন্ধু বাবু চন্দ্রকান্ত পাইনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি স্বদেশ গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। চন্দ্রকান্তও এখানকার এক জন প্রধান উকীল এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমাকে দেখিয়া তিনি কতই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, তাঁহার হৃদয়-সম্ভূত সম্ভাষণে আমি মুগ্ধ হইলাম। বহুদিনের পর দুইটী বন্ধুর মিলন হইলে কতই হৃদয়ের কথা হয়; আমরা অনেকক্ষণ আনন্দে অতিবাহিত করিলাম। বৈকালে চন্দ্রকান্ত অনেকগুলি খেলানা ও মিষ্টান্ন লইয়া আমার বালকবালিকাদিগকে দেখিতে আসিলেন। রাত্রিতে তাঁহার বাসায় ষোড়শোপচারে উদর-দেবের পূজা হইল।

২৯।৩০শে জুন—দুই দিনই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইল। ঘরের বাহির হই নাই। বাসার নিকটবাসী দুই একটী বন্ধুর সহিত কথা-বার্ত্তায় সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

১লা জুলাই রবিবার—হাটে গেলাম, কিন্তু দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়াছিল বলিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি অল্পপরিমাণে খরিদ করিলাম। লাট সাহেব মর্ত্ত্যে গমন করিবেন বলিয়া পারিষদ ও অনুচর বর্গ অদ্য হইতেই অবতরণারম্ভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে 'বার্চ্চ হিল' দেখিয়াছিলাম, কিন্তু ভালরূপ দেখা হয় নাই বলিয়া ঐ পাহাড়টী আবার দেখিতে গেলাম। পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। কতপ্রকার যে বৃক্ষ দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। এই পর্ব্বতের উচ্চতম স্থানে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ আছে, পরিদর্শকগণ তথায় বিশ্রাম করেন। ঐ গৃহ হইতে অদূরে একটী কুটীর আছে, তথায় শৈলবিহারী ইংরেজগণের খাদ্য পাক হয়। ধন্য বিলাতবাসী! তুমিই উদর-দেবের প্রকৃত উপাসক। অবিচলিত তোমার ভক্তি, অকৃত্রিম তোমার প্রেম। এই দেবশ্রেষ্ঠের উপাসনার জন্য তুমি দেশ-বিদেশ হইতে উপকরণ

আহরণ করিতেছ, দিন দিন নূতন পূজাপ্রণালী উদ্ভাবন করিতেছ। কি জানি পূজার কাল অতীত হইলে নিরয়গামী হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় এই জনশূন্য নিবিড় কাননেও তুমি পূজা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছ।

৩রা জুলাই মঙ্গলবার।—কল্য স্বদেশ-যাত্রা করিব। জিনিসপত্র বান্ধিতে আরম্ভ করিলাম। মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। "রণমুখ সিপাহী আর বাড়ীমুখ বাঙ্গালীর" অনিবার্য্য বিক্রম। মহাবলবান্ ঐরাবতও এ তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। সন্ধ্যার সময়ে মহেন্দ্র বাবু সস্ত্রীক আমার বাসায় আসিলেন এবং পর দিবস তাঁহার বাসায় আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

৪ঠা জুলাই বুধবার।—নয়টাও অতীত হইল, আমরাও ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ষ্টেশনে যাইবার পূর্ব্বে আমার স্ত্রী মহেন্দ্র বাবুর বাসায় গিয়া তাঁহার পরিবারের নিকট বিদায় লইলেন। দার্জ্জিলিঙ্গ ত্যাগ করিতেছি মনে করিয়া তখন একটু কষ্ট হইল। মহেন্দ্র বাবু, হরিলাল বাবু প্রভৃতি বন্ধুগণ ষ্টেশন হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন; সেই সময় বেশী কষ্ট হইয়াছিল। ষ্টেশনে জগদ্বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক

ধার্ম্মিকপ্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দার্জ্জিলিঙ্গ নগর পরিত্যাগ করিলাম। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিতে আরম্ভ করিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিলিগুড়িতে উপনীত হইলাম। মনে মনে হিমালয় গিরিরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। হিমালয় প্রকৃতই 'নগাধিরাজ'। ইহা নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। সহস্র সহস্র নির্ঝর এই পর্ব্বতমালা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া জলপ্রপাতাকারে নিম্নগামী হইতেছে, এবং পরিণামে নদ-নদ্যাকারে পরিণত হইয়া সমগ্র ভারতভূমি অভিষিক্ত করিতেছে। এই পর্ব্বতরাজ হইতে পবিত্রসলিলা সুরধুনীর উৎপত্তি; ইহা হইতেই অজেয় ব্রহ্মপুত্র নদ নির্গত হইয়া জলকল্লোলে পূর্ব্ব বঙ্গ কম্পিত করিতেছে। ইহার নির্ঝর-নিকর, নদনদ্যাদি, বৃক্ষশ্রেণী, তরুরুহরাজি, গিরিকুন্তলসমূহ, চিরতুষারমণ্ডিত তুঙ্গ শৃঙ্গনিচয়, যে কোন নৈসর্গিক পদার্থ দর্শন করিবেন, তাহাই অপূর্ব্ব ও অলৌকিক মনে হইবে এবং হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইবে। ইতি

ভবদীয় একান্ত অনুগত

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।